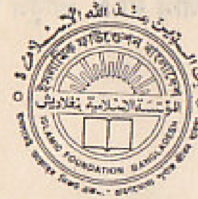
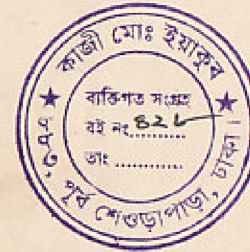
আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য



আমি কেন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিলাম না



আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

আমি কেন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিলাম না ঃ আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৫৬

ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯১

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৭৭
শাওয়াল ১৩৯৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ১৯৮২
জমাদিউস সানি ১৪০২

তৃতীয় মুদ্রণ (ইফাবা প্রথম)
ডিসেম্বর ১৯৯০
জমাদিউস সানি ১৪১১
পৌষ ১৩৯৭

প্রকাশনায়
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকনে
আজিজুর রহমান

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

মূল্য ঃ ২০'০০ টাকা মাত্র

AMI KEN CHRISTADHARMA GRAHAN KARILAM NA (Why I did not Embrace the Christian Religion) : written in Bengali by Abul Hossain Bhattacharjee and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. December 1990

Price : Tk. 20·00, U. S. Dollar : 1·50

উৎসর্গ
অনুসন্ধিৎসু ভ্রাতা-ভগ্নিদের উদ্দেশে
গ্রন্থকার

প্রকাশকের কথা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অন্যতম ধর্ম খৃস্টধর্ম। এর প্রবর্তক যীশুখৃস্ট, যাঁকে মুসলিমরা ঈসা (আ) বলেন এবং নিজেদের নবী বলে পরিচয় দেন। বলা বাহুল্য, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবসমূহকে অস্বীকার করেনি। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে যেহেতু বিকৃতি প্রবেশ করেছে এবং তা মানুষের দ্বারা সংশোধিত এবং সংযোজিত হয়েছে সেজন্যই মুসলিমদের জন্য বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনুল করীম নাযিল হয়েছে এবং সকল মুসলিমকে এর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বস্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফলে ইসলামকে গ্রহণ করতে হলে এই পবিত্র গ্রন্থের বিধানকে মানতে হবে এবং তাঁর আদর্শের অনুসরণ করতে হবে। আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

অতিশয় সচেতন মানুষ হিসেবে ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় বিভিন্ন ধর্মের দোষ-গুণকে তিনি তীক্ষ্ণ মেধা ও মনন দিয়ে দেখেছেন এবং তার গুণাগুণ বিচার করার পর তাঁর জন্যে উপযুক্ত ধর্মকে

তিনি নির্বাচন করেছেন—তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলিম হয়েছেন।

তাঁর এই ধর্ম-সমীক্ষা ও ধর্ম নির্বাচনের কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি 'আমি কেন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিলাম না' বইটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভুমিকায় বলেছেন—"কারো মনে কণামাত্র আঘাত দেয়া বা কোন ধর্মের নিন্দা-কুৎসা প্রচারের সামান্যতম ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার নেই। সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমি কলম ধরেছি।"

বস্তুত তাঁর বর্তমান গ্রন্থের সবটাই এই সত্যের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যে লিখিত হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন ইসলামের শাশ্বত মানবিক সৌন্দর্যই তাঁকে অন্য ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। তিনি অন্য ধর্মকে মন্দ বলেন নি কিন্তু যে ধর্মের মুখোশের অন্তরালে যারা কদর্যভাবে পৃথিবীর বুকে শয়তানের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে সে মুখোশ তিনি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। এ বইটি বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সত্য-উদ্‌ঘাটন বিষয় বলে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বাইরে থেকে এ সুখ্যাত গ্রন্থটির ২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটির এ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে নতুন করে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা যায়, গ্রন্থটি পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

সূচী

পূর্বকথা/১
গোড়ায় যদি গলদ থাকে/১০
মৌলিকতা/১০
সার্বজনীনতা/১৬
যুগোপযোগিতা/১৭
ইঞ্জিল-বাইবেল-সুসমাচার/১৯
নামের পরিবর্তন/২০
ভাষার পরিবর্তন/২১
ভাবের পরিবর্তন/২৪
সংকলন-সংরক্ষণের ত্রুটি/২৫
দু'টি স্বীকারোক্তি ও কয়েকটি অভিমত/২৯
প্রতিক্রিয়া/৩১
মানব শিশু ও শিশু মানব/৩২
প্রতিকার-প্রচেষ্টা/৩৩
সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাংগে/৩৪
শেষ পরিণতি/৩৫
সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতা/৫২
ইহুদী সম্প্রদায়/৫৫
খৃস্টান সম্প্রদায়/৫৬
আসুন! ভাল করে ভেবে দেখি/৫৯
কেন এ ছলনা/৭১
ভবিষ্যদ্বাণীটি কিভাবে সফল হল/৭৯
এক যাত্রায় ভিন্ন ফল/৮৪
উপসংহার/৯৫
খৃস্টান মনীষীদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ/১০৫
ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে
খৃস্টান মনীষীদের অভিমত/১১০

পূর্ব কথা

নানা কারণে পৈতৃক ধর্মের প্রতি আস্থা হারানোর পরে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসেবে সর্বপ্রথমে যে ধর্মের কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল, তার নাম যে খৃস্টধর্ম 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম' নামক পুস্তকের পাঠক মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

যেসব কারণে সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মের কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল উক্ত পুস্তকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিজ্ঞ পাঠক-মণ্ডলীর বিবেচনার জন্যে উক্ত কারণসমূহের কয়েকটি মাত্রকে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল ঃ

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধারণা, বিশ্বাস, অভিমত, অভিরুচি প্রভৃতির গুরুত্ব ও মর্যাদা যে কত বেশি সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। আবহমানকাল যাবত সকল দেশের মানুষ কর্তৃক এ গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে এবং পেতে থাকবে। খৃস্টধর্মের অনুসারিগণই পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যা-গরিষ্ঠ। অতএব, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

ধন-দৌলত, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মান-সম্ভ্রম, শিক্ষা-সভ্যতা প্রভৃতির দিক দিয়েও খৃস্টধর্মাবলম্বীরাই সর্বাধিক উন্নত ও অগ্রসর।

বিশ্বব্যাপী তাঁদের বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অন্ধ-আতুর, রুগ্ন-বিকলাঙ্গ, দুস্থ-অনাথ প্রভৃতির সেবার কাজ তাঁরা অতীব নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলার খবর পাওয়ার সাথে সাথে খৃস্টধর্মাবলম্বী স্বেচ্ছাসেবকেরাই ত্রাণ-সামগ্রী মাথায় নিয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে প্রাণঢালা সেবা-যত্নের কাজে আত্মনিয়োগ করছেন।

খৃস্টধর্মাবলম্বিগণই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছুটে গিয়ে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র গড়ে তুলছেন, যুগোপযোগী ও সর্বাধিক উন্নত প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সর্বসাধারণের কাছে খৃস্টধর্মের মাহাত্ম্যকে সার্থকভাবে তুলে ধরছেন। বিশেষ করে, এ সব কেন্দ্রের মাধ্যমে অজ্ঞ-অশিক্ষিত ও সভ্যতার আলোক বিবর্জিত মানুষদেরকে ধর্মীয় আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সর্বোপরি, খৃস্টধর্মের প্রচারকার্য যাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের যোগ্যতা, ত্যাগী মনোভাব, অমায়িক ব্যবহার, একনিষ্ঠতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সে কথা অস্বীকার করতে পারেন না।

মানুষ মাত্রই সত্যানুসন্ধিৎসু। এ সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে তার সন্ধানও পায়। কিন্তু সে সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে যখনই স্নেহ-মমতার বাঁধন, আশ্রয়, সহায়-সম্পদ, জীবনের নিরাপত্তা প্রভৃতির প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন অনেকের পক্ষেই সত্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ প্রশ্নগুলোর কথা বিবেচনা করে খৃস্টধর্মের অনুসারিগণ নবদীক্ষিতদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বলা বাহুল্য, গুণের জন্যেই এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। খৃস্টানদের উদ্যম, কর্মতৎপরতা, স্বাধীন ও শ্রমশীল মনোভাব, উদ্ভাবনী শক্তি, অনুশীলনপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণ আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ে খৃস্টানদের রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হত না। ভারতবর্ষের বুকেও তখন তাঁরা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজধর্মের প্রতি প্রজা সাধারণের একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকা ও তা গ্রহণ করা গৌরবজনক মনে করাকে অন্যায় বলা গেলেও অস্বাভাবিক বলা যায় না। আর যায় না বলেই অতি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও আমার মনে যে রাজধর্মের কিছুটা প্রভাব পড়েছিল সে কথাও আমি অস্বীকার করতে পারি না।

উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যে খৃস্টধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু ভালভাবে সব কিছু না জেনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আমি সংগত মনে করিনি এবং সে কারণেই আমি যে জনৈক খৃস্টান বন্ধুর পরামর্শে তদানীন্তন কালে কলিকাতার ইন্টালী এলাকায় বসবাসকারী রেভারেণ্ড জন ফেইতফুল সাহেবের কাছে গিয়ে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে

জানতে চেষ্টা করেছি এমন কি, কিছু দিন যে গির্জায়ও যাতায়াত করেছি 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম' নামক পুস্তকে সে কথার উল্লেখ রয়েছে।

মরহুম খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ, মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মরহুম খান বাহাদুর সৈয়দ হাতেম আলী প্রমুখের নিকট গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার সুযোগও যে আমার হয়েছে, উক্ত পুস্তকের সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে সে কথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। তবে নতুন করে একথা বলার প্রয়োজন রয়েছে যে, মৌখিক আলাপ-আলোচনা ছাড়াও মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'মোস্তফা চরিত' আমি পাঠ করি এবং তা থেকে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যাদি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে অন্য যে পুস্তকখানা আমার খুবই সহায়ক হয়েছিল, তা হল— মরহুম মুন্শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের লিখিত 'রদ্দে খৃীষ্টিয়ান'।

এ সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে জানতে পারি যে, জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, কাব্যনিধি নামক জনৈক ব্যক্তি নিজের ধর্ম ছেড়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন।

তিনি কেন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেন আবার কেন-ই বা ফিরে এলেন সে কথা জানার জন্যে বিশেষ একটা আগ্রহ অনুভব করতে থাকি। কিন্তু বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্যে সে সময়ে উক্ত বিদ্যাবিনোদ সাহেব এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর নাগাল পাওয়াই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সে যা হোক, কিছুদিন চেষ্টার পরে সৌভাগ্যবশত তাঁর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হই।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ ছিল এরূপ—"অসভ্য উপজাতীয় এবং অনুন্নত মানুষেরা যেসব দেশে রয়েছে সেসব দেশেই সাধারণত খৃস্টান মিশনারীদিগকে তৎপর থাকতে দেখা যায়। সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত দেশগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে যে, অনুন্নত এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা যেসব অঞ্চলে বেশী রয়েছে, খৃস্টান মিশনারীরা সেসব অঞ্চলকেই তাঁদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছেন।"

"অসভ্য লোকদিগকে সভ্য করা বা অনুন্নতদিগকে উন্নত করার প্রেরণা এর মাঝে আছে কি না জানি না, তবে কেউ যদি মনে করে যে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, ধর্ম

সম্পর্কে অজ্ঞ, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা নিপিষ্ট-নিপীড়িত এ সব মানুষকে অতি সহজেই দলে ভিড়ানো সম্ভব বলেই খৃস্টান মিশনারীরা ঐ এলাকাগুলোকে বেছে নিচ্ছেন তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না।"

"এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বহুসংখ্যক মিশনারী বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় এবং বহু বছরের চেষ্টায় আজ পর্যন্ত দেশবরেণ্য মানুষদিগের একজনকেও খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন নি, এমন কি মোটামুটিভাবে শিক্ষিত এবং সচেতন কোন মানুষও আজ পর্যন্ত তাদের ধর্মকে মেনে নেয়নি।

পক্ষান্তরে, মুসলমানদের চেষ্টা সাধনা ছাড়াই শুধু ইসলামের শিক্ষা ও সত্যতায় মুগ্ধ হয়ে খৃস্টান জগতের দিকপাল সদৃশ লর্ড হেডল, ডঃ শেলড্রেক ডি-লিট, মি. ফ্রান্সিস ডি-মেলো, মি. কার্ডেল রায়ান প্রভৃতি ও আমেরিকার প্রখ্যাত ধনকুবের মি. রেক্স্ ইনগ্রাম প্রমুখ শত শত খৃস্টান স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন। শুধু তা-ই নয়, ইসলাম প্রচারের জন্যে মিশন, মিশনারী প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তার কোনটা-ই নেই, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা রাজশক্তিও নেই। তথাপি শুধু ইসলামের সত্যতার জন্যে প্রতি বছর পৃথিবীর সকল বর্ণের সকল ধর্মের এবং ধনী-দরিদ্র-ক্ষুদ্রভদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে চলেছেন।"

এ পর্যায়ে বিদ্যাবিনোদ সাহেব আলমারি খুলে 'তবলীগ' নামক সংবাদ-পত্রের একটি সংখ্যা বের করে আনেন এবং তাঁর কথার সমর্থনে উক্ত সংবাদ-পত্রের একটি স্থানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাতে আদমশুমারীর বরাত দিয়ে ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে অর্থাৎ এ দশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যেসব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার মোটামুটি একটা হিসেব তুলে ধরা হয়েছিল। সর্বমোট সংখ্যাটি ছিল—৭২,৩৩,৭৩৬; উক্ত সংখ্যাটির নিচে অঙ্গুলি স্থাপন করে তিনি বলেছিলেন—'সংখ্যাটি মনে রাখতে চেষ্টা করবেন।'

অতঃপর বিদ্যাবিনোদ সাহেব বলেছিলেন—"পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের যিনিই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন, তিনিই ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য এবং সত্যতায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। অবশ্য নানা কারণে এঁদের সকলের পক্ষে পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তা না হলেও ইসলামের মহান শিক্ষা, অনুপম সৌন্দর্য এবং অনাবিল সত্যতা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমতকে তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, এ সব পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে অনেক খৃস্টানও রয়েছেন। তাঁদের অভিমতগুলো পাঠ করলেই খৃস্টধর্ম সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।"

"তার পরে তাদের মদ্যপান, জুয়াখেলা, বিলাসিতা, ব্যভিচার এবং সেই ব্যভিচারের ফলে কত সহস্র জারজ-সন্তান জন্ম নিচ্ছে এবং প্রতি বছর কত সহস্র ভ্রূণ হত্যার কাজ অবাধে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসব খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা ঐসব ছোটখাটো গুণ দেখে আকৃষ্ট হতে পারেন না।"

"তাঁদের নিজেদের দেশেও যথেষ্ট গরীব-দুঃখী রয়েছে। পাপী-নরা-ধমদিগের সংখ্যাও সেসব দেশে মোটেই কম নয়। অতএব, সেবা ও 'সুসমা-চার' প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ তো সেখানেই রয়েছে।"

এমতাবস্থায় 'ঘর ছেড়ে পরের সেবায়' এমন মাতামাতির উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্যবাদের কদর্য চেহারাটাকে সুকৌশলে ঢেকে রেখে মতলব সিদ্ধি করা; অন্তত ভারতীয় মুসলমানদের সে কথা মোটেই অজানা নয়।

"কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করে এবং অসংখ্য অগণিত মানুষকে পথের ফকিরে পরিণত করে যে পাপ তারা সঞ্চিত করেছেন এবং করে চলেছেন দু'চারটা সেবা প্রতিষ্ঠান, ছিটে-ফোঁটা সাহায্য দিয়ে সে পাপ খণ্ডন করা সম্ভব নয়। এবং সেবার নামে বোকা লোকদিগকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হলেও তাদের মনে রাখা উচিত যে, সকল দেশেই চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রয়েছেন এবং সর্বোপরি রয়েছেন—বিশ্ববিধাতা। সুতরাং এসবের পরিণতি আজ হোক আর কাল হোক, তাহাদিগকে ভোগ করতেই হবে এবং তা করতে হবে—অতি নির্মম-ভাবেই।"

অতঃপর তিনি তাঁর সংরক্ষিত সংবাদপত্র ও সাময়িকী থেকে বিভিন্ন ধর্মের কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমত পাঠ করে শোনান এবং তাঁর নিজের লিখিত 'ইসলামী বক্তৃতা' ও জনাব শামসুর রহমান লিখিত 'নও-মোসলেমের আত্মকথা' নামক দু'খানা বই আমাকে পাঠ করতে দেন।

বিদায়ের সময়ে প্রয়োজন মত তাঁর সাথে দেখা করার উপদেশ দেন ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কীয় কতিপয় বই-পুস্তকের নাম ঠিকানা লিখে নিতে বলেন।

উল্লেখ্য যে, ওখান থেকে ফিরে আসার সময় পথ চলতে গিয়ে বিদ্যা-বিনোদ সাহেবের কথাগুলো, দশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের ইসলাম গ্রহণকারী মানুষদের সংখ্যা এবং ইংরাজ-রূপী খৃস্টানদের ভারতে আগমন, শঠতা-ষড়যন্ত্রের সাহায্যে শাসন ক্ষমতা দখল ও অতি জঘন্য ধরনের শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার ঘটনাসমূহ পুনঃ পুনঃ আমার মনের পাতায় ভেসে উঠছিলো —আর পাশাপাশি ভেসে উঠছিলো মহাত্মা যীশুখৃস্টের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণীসমূহের এ তিনটি বাণী ঃ "কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে তবে অন্য গালটিকেও তার দিকে ফিরিয়ে দাও" আর "তোমরা ঈশ্বর ও ধন এক সাথে এ উভয়ের দাস হতে পারো না" এবং "সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু কোন ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।"

সে যা হোক, পরবর্তী সময়ে ওসব বই-পুস্তক ছাড়াও বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কীয় কয়েকখানা গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ আমি গ্রহণ করি। তাছাড়া আরও কতিপয় প্রখ্যাত নও-মুসলিমের আত্মকথা এবং অমুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমত নানা সূত্র থেকে জানার সুযোগও আমার হয়েছিল।

মোট কথা, আমার সীমিত সাধ্যানুযায়ী আমি খৃস্টধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তই আমাকে গ্রহণ করতে হয়। কেন করতে হয় সেকথা বলার জন্যেই এ পুস্তকের অবতারণা।

কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে, খৃস্টধর্মকে মিথ্যা বলার জন্যেই আমি কলম ধরেছি তবে তাঁকে নিরাশই হতে হবে। কেননা আমি যত দূর জানতে পেরেছি, তা থেকে বেশ নির্ভরশীলতার সাথেই বলতে পারি যে, খৃস্টধর্ম মিথ্যা নয়।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, মিথ্যাই যদি না হয়, তবে সে ধর্ম আমি গ্রহণ করলাম না কেন? উল্লেখ্য যে, এ প্রশ্নের উত্তর যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। তবে সে উত্তরের পূর্বাভাস স্বরূপ এখানে এতটুকুই বলা যেতে পারে যে, আমার জানা মতে ধর্মটি সত্য। কিন্তু এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত এবং স্বার্থশিকারীদের বিশেষ একটি শ্রেণী সে সত্যকে সত্য হয়ে টিকে থাকতে দেয়নি। শুধু তা-ই নয়—অজ্ঞতা, কূপমণ্ডুকতা, হীনমন্য বৃত্তি এবং স্বার্থান্ধতার জন্যে তাঁরা ধর্মীয় পরিবেশটাকেই এমন জঘন্যভাবে ঘোলাটে এবং কলুষময় করে রেখে গেছেন যে, সে পরিবেশে সত্যকে সত্য করে উপলব্ধি করার মতো মন-মানসিকতাই গড়ে উঠতে পারছে না।

এ পূর্বাভাসটুকু দেয়ার পরে বলতে হচ্ছে যে—সত্যকে সত্যরূপে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কলম ধরেছি। কারো অনুভূতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসে কণামাত্র আঘাত দেয়ার ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার নেই। তথাপি নিজের অজ্ঞাত-সারে অথবা অযোগ্যতার জন্যে কারো মনে সামান্যতম আঘাত লাগার মতোও কিছু যদি লিখে থাকি—সে জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

খৃস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি যথেষ্টই রয়েছেন। মানব-প্রেম, উদারতা এবং পরমত-সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে তাঁদের অনেকেই যে যীশুখৃস্টের মহান আদর্শের অনুসারী, অন্তত অনুসারী হওয়ার জন্যে যত্নবান, সে প্রমাণও অনুপস্থিত নয়। অতএব, মূল নিবন্ধে আমার তুলে ধরা তত্ত্ব ও তথ্যাবলীকে অন্যরা না হলেও অন্তত এ শ্রেণীর মানুষেরা যে উদার ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পাঠ করবেন এবং যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন সে বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়রূপেই আমি পোষণ করি।

আলোচনার সুবিধার জন্যে আলোচ্য বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শিরোনাম দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে কতিপয় উপ-শিরোনামও ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু সত্য পথের সন্ধানরত ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমার মনে গভীর উৎসাহ এবং প্রেরণা সৃষ্টি করে-ছিল—অতএব, প্রখ্যাত খৃস্টান মনীষীদের যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের কতিপয়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ পুস্তকের শেষ দিকে "খৃস্টান মনীষীদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ" শিরোনাম দিয়ে তুলে ধরা হল ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত বিদ্যাবিনোদ সাহেব দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমতের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আর সে অভিমতসমূহ আমার মনে গভীর রেখাপাতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব, এমনি ধরনের কয়েকটি অভিমতকে 'ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে খৃস্টান মনীষীদের সুচিন্তিত অভিমত' শিরোনাম দিয়ে সর্বশেষ নিবন্ধ হিসেবে তুলে ধরা হবে। যেহেতু খৃস্টধর্মের মূল শিক্ষা, বাইবেলের মৌলিকতা এবং তাতে সন্নিবেশিত বাক্যাবলীর যুগোপ-যোগিতা প্রভৃতি নিয়ে আমি পর্যালোচনা করেছিলাম। অতএব পুস্তকের প্রথমেই যথাক্রমে 'গোড়ায় যদি গলদ থাকে' 'ইঞ্জিল—বাইবেল-সুসমাচার' এবং 'আসুন

ভাল করে ভেবে দেখি' শিরোনাম দিয়ে আমার বক্তব্যকে তুলে ধরা হবে। তারপরে থাকবে—'উপসংহার'।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কারো মনে কণামাত্র আঘাত দেয়া বা কোন ধর্মের নিন্দা-কুৎসা প্রচারের সামান্যতম ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার নেই। সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমি কলম ধরেছি।

এতদ্বারা সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার কাজে কতটুকু সফল হয়েছি অথবা মোটেই হয়েছি কি না বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীই সে বিচার করবেন। যদি সফল হতে না পেরে থাকি সে ত্রুটি একান্তরূপেই আমার নিজস্ব। নিজের অজ্ঞতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকার পরেও প্রয়োজনের তাকীদে একান্ত বাধ্য হয়েই এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কলম ধরতে হয়েছে। অতএব, বইখানাতে নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনের দিকে চেয়ে সেগুলোকে ক্ষমার চোখে দেখলে আমি বিশেষভাবে বাধিত হব।

যোগ্য ব্যক্তিরা কালবিলম্ব না করে এ কাজে এগিয়ে আসুন এবং সার্থক-ভাবে সত্যকে সত্যরূপে তুলে ধরুন সর্বান্তঃকরণে এ কামনাই করি।

প্রসঙ্গের উপসংহারে বলতে হচ্ছে যে, মানুষকে সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে উঠার কাজে প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি এবং যথাযোগ্য পথনির্দেশ দানই যে ধর্মের মূল লক্ষ্য এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীরাও প্রত্যেকেই এটাই যে তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের মূল লক্ষ্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সে দাবিও করে থাকেন। অথচ কার্যত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ গড়ার পরিবর্তে জঘন্য ধরনের অমানুষ গড়ে উঠছে; ধর্মীয় কোন্দল এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রাণঘাতী শত্রুতে পরিণত করছে, এক ধর্মের নিন্দায় অন্য ধর্মের মানুষের পঞ্চমুখ হওয়াকে ধার্মিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে অব-লীলাক্রমে নিন্দা ছড়ানোর কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমি মনে করি যে, সত্যকে সত্য করে জানার ত্রুটিই এসব কিছুর জন্যে দায়ী। অতীতের সে অন্ধকার যুগে সত্যকে সত্য করে জানার পথে নানা অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান ছিল। সুতরাং সে সময়ে ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি এবং কোন্দল-কোলাহল অস্বাভাবিক ছিল না।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় যখন চার-দিক উদ্ভাসিত, সে সময়েও যদি সত্যকে সত্য করে জানা এবং সে সত্যকে সর্বপ্রযত্নে আঁকড়ে ধরার কাজে আমরা অতীতের পুনরাবৃত্তিই ঘটাতে থাকি

তবে সেটা শুধু দুর্ভাগ্যজনকই হবে না, তদ্দ্বারা নির্মম ধ্বংসকেও নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করে তোলা হবে।

অতএব আসুন! সত্যকে সত্য করে জানার চেষ্টা করি এবং সে সত্যকে সর্বতোভাবে আঁকড়ে ধরে নিজদেরকে সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে তুলি। বিশ্বপ্রভু আমাদের এ কাজে সহায়ক হোন, কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনাই করি।

নানারূপ প্রতিকূলতার জন্যে পুস্তকখানার কলেবর প্রয়োজন মতো বাড়ানো সম্ভব হল না। ফলে আমার সংগৃহীত অনেকগুলো তত্ত্ব ও তথ্যই অনুক্ত রয়ে গেল। বিশ্বপ্রভু যদি সময় ও সুযোগ দেন আগামীতে এ গ্রন্থটি বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হবে। এ ক্ষুদ্র পুস্তক যদি সমাজের সামান্যতম উপকারেও লাগে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

খাকছার
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

গোড়ায় যদি গলদ থাকে

'পূর্বকথা'য় উল্লিখিত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার পরে আমি বেশ ভালভাবেই অনুভব করেছিলাম যে, একটি গ্রহণযোগ্য ধর্ম খুঁজে বের করতে হলে অন্তত তিনটি বিষয়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দিয়ে আমার এ অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর সে বিষয় তিনটি হল—তার উৎস এবং মৌলিকতা সন্দেহ-মুক্ত কি না, সার্বজনীন কি না এবং তার শিক্ষা যুগের উপযোগী কি না।

অন্তত ধর্মের ব্যাপারে কেন এ তিনটি বিষয়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর সে-কথা অবশ্যই বেশ ভালভাবে জানা রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছেন, এ সম্পর্কে যাঁদের ধ্যান-ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। অন্তত তাঁদের অবগতির জন্যে এ তিনটি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন—যদিও বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে তা অপ্রয়োজনীয়; হয়তো বা বিরক্তিকরও বিবেচিত হতে পারে।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে গিয়ে প্রথমে 'মৌলিকতা' উপ-শিরোনাম দিয়ে উৎস বা গোড়ার কথা এবং পরে যথাক্রমে 'সার্বজনীনতা' এবং 'যুগোপযোগিতা' উপ-শিরোনাম দিয়ে অন্য বিষয় দু'টিকে তুলে ধরা হ'ল।

মৌলিকতা ঃ কোন কিছুর গোড়ায় যদি গলদ থাকে তবে তা যত সুন্দর ও যত চাকচিক্যপূর্ণই হোক না কেন, গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অতএব, কোন কিছুকে জানতে হলে প্রথমেই তার গোড়া বা উৎস সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, ধর্মের বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। বরং যেহেতু ধর্ম অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়, আর যেহেতু মানুষের দেহ-আত্মা

ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি সব কিছুর সাথে ধর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অতএব ধর্ম সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়। আর তা দিতে হলে ধর্মের গোড়া বা উৎসের সন্ধানকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ উৎস বা গোড়া সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যে কথা-গুলো আমার মনে বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা মোটামুটি এ-ই ছিল যে—

o যিনি এ বিশ্বের, বিশেষ করে মানবমণ্ডলীর স্রষ্টা একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে অবহিত রয়েছেন বা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্যকরূপে অবহিত থাকা সম্ভব যে, কি বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কোন্ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্যে তিনি মানবমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন। আর কোন্ পথে বা কি উপায়ে মানবের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সম্পাদিত হতে পারে সে কথাও একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে অবহিত রয়েছেন বা সম্যকরূপে অবহিত থাকা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

যেহেতু তিনি শুধু স্রষ্টাই নন—বিশ্ব নিখিলের একমাত্র প্রভু, একমাত্র মালিক এবং একমাত্র পরিচালকও তিনিই; অতএব এ পরিচালনা, নির্দেশদান, বিধি-নিষেধের আরোপ এবং তিরস্কার-পুরস্কার প্রদানের যোগ্যতা এবং অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। আর তা-ই সংগত এবং স্বাভাবিক।

o যেহেতু একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, অন্য-নিরপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন। অতএব, মানুষের জন্যে নির্ভুল, নিরপেক্ষ, ত্রুটিহীন এবং সার্বজনীন বিধি-বিধান রচনার যোগ্যতা এবং অধি-কারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ চিন্তাধারা থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা আমার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল যে, ধর্মীয় বিধানের গোড়া বা উৎস একটিই, অর্থাৎ বিশ্বপতি স্বয়ং। উল্লেখ্য, তিনি যে বিধানদাতা, তাঁর 'বিধাতা' নামটিই সে কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। অতএব ধর্মের গোড়া বা উৎস যে তিনি-ই সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকছে না।

এখানে সাথে সাথে অন্য যে কথাটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল ঃ যেহেতু তিনিই একমাত্র প্রভু এবং যেহেতু বিধান দেয়ার যোগ্যতা এবং

অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে আর যেহেতু প্রভুর বিধানকে সর্বতোভাবে মেনে চলা ছাড়া দাসের আর কোন কর্তব্যই থাকতে পারে না—অতএব অন্য কারো বিধানকে বিধান বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা বা মেনে চলার কোন সুযোগ এবং কোন অধিকারই কোন মানুষের থাকতে পারে না।

গোড়ায় গলদ থাকা সম্পর্কে এখানে এ প্রশ্নটি দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক যে, যেহেতু ধর্মের গোড়া বা উৎস হলেন স্বয়ং বিশ্ববিধাতা ; এমতাবস্থায় এমন মহান উৎস থেকে উৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে অর্থাৎ তার গোড়ায় কি করে গলদ থাকতে পারে ?

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি খুবই জটিল, সুতরাং দু'চার কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আর সে যোগ্যতাও আমার নেই। তবে সাধ্যানুযায়ী খোঁজ-খবর নেয়ার পরে কর্মের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্পর্কীয় ঘটনাসমূহের যে বাস্তব চিত্র সেদিন আমার কাছে ফুটে উঠেছিল, চিন্তার খোরাক স্বরূপ সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে তা তুলে ধরছি।

ক. সেদিন এমন ধর্মেরও সন্ধান আমি পেয়েছি : যেগুলো একান্তরূপেই মানুষের কল্পনাপ্রসূত। অর্থাৎ ধর্মের আসল উৎস বা বিশ্ববিধাতার সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। অন্য কথায়, গলদের উপরেই যেগুলোর গোড়া বা ভিত্ গড়ে উঠেছে বা গড়ে তোলা হয়েছে।

খ. এমন ধর্মও রয়েছে, যেগুলোর গোড়ায় কোন গলদ ছিল না। অর্থাৎ সেই মূল উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীনত্ব, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নাশকতামূলক কার্যকলাপ বা ধ্বংস-লীলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংরক্ষণের ত্রুটি, ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা প্রভৃতি নানা কারণে সেগুলোর মৌলিকতা এমনভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে যে, ওগুলোর মূল শিক্ষা কি ছিল, সে কথা জানার কোন উপায়ই আজ আর অবশিষ্ট নেই।

গ. কপট-বিশ্বাস, অজ্ঞতা-অযোগ্যতা এবং ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত এবং এক শ্রেণীর স্বার্থ-সর্বস্ব মানুষের ঘৃণ্য তৎপরতার ফলে ছাঁটাই-বাছাই হতে হতে কোন কোন ধর্মগ্রন্থ আজ 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত হয়েছে।

ঘ. শাসন-ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, প্রাধান্য-পিয়াসী যাজক-সম্প্রদায়, সহজ পথে ও স্বল্প সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জনে অভিলাষী ব্যক্তিদের একটি বিশেষ

শ্রেণী প্রভৃতি কোন কোন ধর্মকে যে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে নানাভাবে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করেছে তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

ঙ. সুদূরের সেই অন্ধকার যুগে গড়ে উঠা কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, কূপ-মণ্ডুকতা প্রভৃতি এবং সেকালের যুক্তিহীন প্রথা-পদ্ধতিসমূহকে বংশানুক্রমিক-ভাবে নিজেদের মনমস্তিষ্কের সাথে বহন করে এনেছেন এমন এক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম-বিধানের ব্যাখ্যা করতে ও ভাষ্য দিতে গিয়ে কেউবা স্বেচ্ছা-কৃতভাবে আর কেউবা অসতর্কতা বশত তার মাঝে নানা ধরনের আজগুবি, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথাকাহিনীকে এমনভাবেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, আজ আর সেগুলোকে পৃথক করা সম্ভবই নয়।

চ. অনাসক্তি এবং আত্মিক উন্নতির গূঢ় তত্ত্ব অনুধাবনে অক্ষম অথবা ভ্রান্ত বা বিকৃত ধারণা পোষণকারী এক শ্রেণীর তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের মন-মগজে বৈরাগ্যবাদ এবং আধ্যাত্মি-কতাবাদের নামে এক ধরনের উৎকট চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন।

ছ. ধর্মীয় বিধানে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বরূপ, শক্তিমত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে একত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, অবতারবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী নানা বাদের হট্টগোল সৃষ্টি করে ধর্মের মূল শিক্ষাকেই বিকৃত, বিভ্রান্তিকর এবং অবোধগম্য করে তুলেছেন।

জ. যেহেতু ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়, আর যেহেতু সংশয়-সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ থাকলেও কোন কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়, অতএব ধর্মীয় বিধানকে সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখার প্রয়োজন যে কত বেশি সেকথা সহজেই অনুমেয়।

বলা বাহুল্য, নানা কারণে এসব সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। তার মধ্যে মৌলিকতার প্রশ্নটিই প্রধান। আর মৌলিকতা বলতে সাধারণত একথাই বোঝায় যে, তা বিশ্ববিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে কি না এবং যেমনটি প্রদত্ত হয়েছিল ঠিক তেমনটিই আছে কি না আর এই তেমনটিই থাকার জন্যে একান্ত অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হয়—তার প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি

অক্ষর এমন কি ছোট-বড় প্রতিটি বিরাম চিহ্নকে হুবহু অর্থাৎ যথাযথ ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের।

কেননা, যে কোন বাক্যের যে কোন শব্দ, যে কোন একটি অক্ষর এমন কি যে কোন একটি বিরাম চিহ্নও যদি কোন কারণে অদৃশ্য বা এদিক ওদিক হয়ে পড়ে অথবা বাইরে থেকে সেরূপ কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে তবে বাক্যটি তাৎপর্যহীন, দুর্বোধ্য, অবোধগম্য এমন কি বিপরীতার্থবোধক হয়ে পড়াও মোটেই বিচিত্র নয়।

যেহেতু ধর্মীয় বাণী-বাহকের তিরোধানের সাথে সাথেই বিশ্ববিধাতার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন আর ধর্মীয় বিধানের কোনরূপ সংশোধন সম্ভব হতে পারে না—অতএব, তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর নিজের দ্বারা, অন্যথায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোক বা লোকদের দ্বারা এ সংরক্ষণের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়া যে একান্তরূপেই প্রয়োজন সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ পৃথিবীতে এমন ধর্ম-বিধানের সংখ্যা মোটেই অল্প নয়—যেগুলোর বেলায় বাণী-বাহকের জীবদ্দশায় তো নয়-ই, এমন কি তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরেও তাঁর মাধ্যমে সমাগত বাণীসমূহকে সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ফলে যখন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তখন দেখা গিয়েছে যে, স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণকারীদের কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, কেউ কেউ কোন কোন কথা ভুলে গিয়েছেন, কেউ কেউ বিস্মৃত কথাগুলো পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে আন্দাজ-অনুমানের উপরে নির্ভর করেছেন। আর কেউ কেউ বা বিশ্বপ্রভুর বাণীর সাথে নিজের মন্তব্যকে জুড়ে দিয়েছেন। আর এমনিভাবে সত্য-মিথ্যা, আন্দাজ-অনুমান, ব্যক্তি বিশেষের মন্তব্য-বিবৃতি প্রভৃতির মিলিত এক অভিনব সংস্করণকে বিশ্ব-স্রষ্টার পবিত্র মুখ-নিসৃত বলে সমাজে চালু করে দেয়া হয়েছে।

খ. পৃথিবীর সকল ভাষায়ই এমন অনেক শব্দ থাকে, যেগুলো দ্ব্যর্থবোধক বা একাধিক ভাব-প্রকাশক। এমতাবস্থায় ধর্মীয় বাণীবাহক স্বয়ং ধর্মীয় কোন্ বাণীটির বেলায় সেরূপ কোন্ শব্দটির কি তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন সেটা জানা না থাকলে নানারূপ ভুল বোঝাবুঝি বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া এমন কি সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থটি সম্পর্কেই সংশয়-সন্দেহের বিষবাষ্প জমে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়।

সে কারণেই ধর্মীয় বাণীবাহক কর্তৃক কোন্ বাক্যের বা কোন্ শব্দের কি তাৎপর্য গৃহীত হয়েছে, তার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে গোটা ধর্মীয় বিধানটিরই ব্যাখ্যা ভাষ্যকে এমনভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যাতে কোন সময়ে তার উপরে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ হতে না পারে বা তেমন কোন প্রয়োজনই দেখা না দেয়।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাণীবাহকগণ তাঁদের মাধ্যমে সমাগত মূল বাণীসমূহকেই যথাযথভাবে সংরক্ষিত করে যেতে পারেন নি বা তেমন সুযোগ পান নি, সেসব ক্ষেত্রে ওসব বাণীর ব্যাখ্যা, ভাষ্য প্রদানের সুযোগ যে তাঁরা পেয়েছিলেন সে কথা খুব নির্ভরতার সাথে বলা চলে না।

আর তাঁদের দ্বারা ব্যাখ্যা-ভাষ্য প্রদত্ত হয়ে থাকলেও যেখানে মূল বাণীসমূহের সংরক্ষণের উদ্যোগই গৃহীত হয়েছিল বাণীবাহকদের তিরোধানের অনেক পরে—সেখানে ব্যাখ্যা-ভাষ্যাদি সংরক্ষণের উদ্যোগ গৃহীত হতে যে আরো অনেক বিলম্ব হয়ছিল সে কথা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

আর এ বিলম্বের মাত্রা ও পরিমাণ যত বেড়েছে মুণি এবং সন্ন্যাসীদের সংখ্যাও যে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কথাও অতি সহজেই অনুমান করা চলে। আর মুণি এবং সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম যে কি সে কথাও আশা করি পাঠকবর্গের বেশ ভালভাবেই জানা রয়েছে।

গ. সুদূর অতীতে লেখ্য ভাষা উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে যেসব ধর্মীয় বাণীর অবতারণ ঘটেছে, বোধগম্য কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে সেগুলোকে সংরক্ষিত করতে হয়েছে। বহুকাল, ক্ষেত্র বিশেষে হাজার হাজার বছর পরে যখন লেখ্য ভাষা উদ্ভাবিত হয়েছে, তখন ওগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণকারীদের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, কেউ কেউ বা অসুস্থতা অথবা বার্ধক্যের কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

স্বাভাবিক ভুল প্রবণতার জন্যে কেউ কেউ সংরক্ষিত বাণীর কোন কোনটিকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম হন নি। এমন প্রমাণও রয়েছে যে, স্মৃতি থেকে এ সব ধর্মীয় বাণীর পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে এই শ্রেণীর স্মৃতিধরগণ অনেকেই আন্দাজ-অনুমানের আশ্রয় নিয়ে ধর্মীয় বাণীর সাথে কোন কোন

কথা জুড়ে দিয়েছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এদের নিজস্ব মন্তব্যকে মূল বাণী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ভণ্ড, কপট-বিশ্বাসী এবং ছদ্মবেশী শত্রুরাও যে এ সুযোগে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে ধর্মীয় বিধানের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে, তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

বিভিন্ন ধর্মের মৌলিকতাকে কিভাবে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে সে কথা বোঝাবার জন্যে আর অধিক তথ্য তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না বলেই মনে করি। অতঃপর দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ ধর্মের সার্বজনীনতা সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়া যাচ্ছে ঃ

তবে কেউ কেউ হয়তো ধর্মগ্রন্থের এই অঙ্গহানি এবং তার মাঝে এমন ধরনের আজগুবি-অবিশ্বাস্য ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কল্প-কাহিনীর সমাবেশ দেখে বিস্মিত অভিভূত হন, মনে মনে হয়তো এগুলোকে অন্যায় এবং মিথ্যা বলেও ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু একান্তই ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় বলে মুখ ফুটে কিছু বলেন না—বলতে পারেন না।

তাঁদের অবগতির জন্যে বলা আবশ্যক যে, এসব অন্যায় এবং অস্বাভাবিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কেননা, কারণ যা-ই হোক, গোড়ায় যদি গলদ থাকে তবে সে গলদের প্রভাবে তার দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য এবং কিম্ভুতকিমাকার ধরনের হয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া, যে জিনিস যত বেশি ভাল এবং যত বেশি মূল্যবান সে জিনিস যদি পচে যায় তবে তার দুর্গন্ধও তত বেশী হয়ে থাকে। আর তজ্জনিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও বেশি ছাড়া কম হয় না। এমতাবস্থায় ধর্মীয় বিধানের মত এমন পবিত্র, এমন মূল্যবান এবং এমন সম্মানিত জিনিসের পচন ধরলে কি অবস্থা হতে পারে সে অনুমান করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়।

সার্বজনীনতা ঃ আমরা জানি এবং বেশ ভালভাবেই জানি যে, সত্য মাত্রই সনাতন, চিরন্তন এবং সার্বজনীন। তাকে কোন ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পদে পরিণত করা যায় না অথবা নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেও আবদ্ধ রাখা যায় না। কেননা, সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথেই তা সকল মানুষের সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়ে যায়।

অতএব যে কোন অবস্থায়, যে কোন পর্যায়ে এবং যে কোন অজুহাতে তাকে কুক্ষিগত করে রাখার অর্থই যে অপরের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অতি নির্মমভাবে পদদলিত করা সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

যেহেতু, ধর্ম একটি সত্য ব্যতীত নহে—অতএব তাকেও কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার কারো থাকতে পারে না। যদি রাখা হয় তবে বুঝতে হবে যে, তদ্দারা অপরের ন্যায্য ও ন্যায়সংগত অধিকারকেই অতি নির্মমভাবে পদদলিত করা হয়েছে অথবা উক্ত ধর্মের সাথে সত্যের কোন সম্পর্কই নেই।

যুগোপযোগিতা ঃ যুগের দাবীকে অস্বীকার করে পৃথিবীতে টিকে থাকা যে সম্ভবই নয়, সেকথা কোন শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

এমতাবস্থায় ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ যদি যুগের চাহিদা অনুযায়ী পথ নির্দেশ দিতে না পারে তবে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন সম্ভব হতে পারে না। আর বাস্তব জীবনে প্রতিফলনই যদি সম্ভব না হ'ল তবে তেমন পোশাকী ধর্মের কোন প্রয়োজনও থাকতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, সে অবস্থায় ধর্ম এক দুরপনেয় বোঝায় পরিণত হয়।

কথাটিকে এভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে যে—মানুষ একটি প্রগতিশীল জীব অর্থাৎ এগিয়ে চলাই তার কাজ। একদিন গুহা জীবন থেকে যাত্রা শুরু করে আজ অনন্ত মহাশূন্যে পাড়ি জমানো থেকেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় মানুষ তার স্বভাবসুলভ প্রেরণায় এগিয়ে যেতে থাকবে আর ধর্ম হাজার হাজার বছরের পশ্চাতে পড়ে থেকে পিছু টেনে তার এগিয়ে চলার গতিকে থামিয়ে দেবে অথবা ব্যাহত-বাধাগ্রস্ত করবে, এমন ধর্মকে নিজেদের এগিয়ে চলা বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অলংঘ্য তাকীদেই যে মানুষ মানতে পারে না—মানা যে সম্ভব নয় সে কথাটা বুঝবার জন্যে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

উপসংহারে এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব এখানে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে—যুগোপযোগিতা হারানোর জন্যেই পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মের মানুষই বাধ্য হয়ে নিজেরা আজ

ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষা কবচ ধারণ করেছে এবং তাদের অচল ধর্মকে উপাসনালয়ের মধ্যে বন্দী করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তরই খুঁজে পাচ্ছে না।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্যে উপরের এ কথাগুলিকে মনে রাখার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অন্ততঃ এ কথা কয়টি কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলবে না যে—"যেহেতু সত্য-মাত্রই সনাতন, চিরন্তন এবং সার্বজনীন, আর যেহেতু ধর্মও একটি সত্য ব্যতীত নহে ; অতএব ধর্মকেও অবশ্যই সনাতন, চিরন্তন, সার্বজনীন এবং যুগোপযোগী হতে হবে ; অন্যথায় তা ধর্ম হতে পারে না—হওয়া সম্ভবই নয়।" আর সাথে সাথে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে—যে ধর্মের মৌলিকতায় সন্দেহ রয়েছে এবং যে ধর্ম সার্বজনীন এবং যুগের উপযোগী নয়, তাকে আঁকড়ে থাকা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাই নয়—আত্মহত্যারও শামিল।

সে যা হোক, ধর্মের মৌলিকতা এবং সার্বজনীনতাকে কিভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, আর কিভাবে পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মই তাদের যুগোপযোগিতাকে হারিয়ে ফেলে অচল-অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তার কতিপয় বাস্তব নিদর্শনকে সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে পরবর্তী নিবন্ধে তুলে ধরা হ'ল।

ইঞ্জিল-বাইবেল-সুসমাচার

নামে-ই পরিচয়ঃ নাম দিয়েই ব্যক্তি, বস্তু, স্থান প্রভৃতির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, যথাক্রমে বহু বস্তু, বহু ব্যক্তি এবং বহু স্থানের প্রত্যেকটিকে পৃথক, স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট রূপে বোঝানোর জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সে কারণেই নামটিকে অর্থপূর্ণ এবং উপযোগী হতে হয়। অর্থাৎ নাম শোনার সাথে সাথেই শ্রোতা যেন নির্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, "সোনার পাথরের বাটি" বা "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" ধরনের নাম শুধু অর্থহীনই নয়—রীতিমত বিভ্রান্তিকরও।

এ কারণেই কোন ভাষার কোন বাক্যকে অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ, সম্মানীয় বা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি, বস্তু অথবা স্থানের নামকে অপরিবর্তিত রাখা হয়ে থাকে, ব্যাকরণের নিয়মও এটা-ই।

উদাহরণস্বরূপ আরবী ভাষায় শহীদুল্লাহ্ শব্দটিকে তুলে ধরা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বিধায় ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুযায়ীই বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় শহীদুল্লাহ্ শব্দটির কোন প্রতিশব্দ নেই বা থাকতে পারে না। কেউ যদি এ চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করতে এবং জোরপূর্বক বাংলা ভাষায় এর একটা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করে নিতে ইচ্ছা করেন তবে 'বলীশ্বর' শব্দটিকেই তিনি হয়তো পছন্দ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ নামে সারা জীবন চিৎকার করেও তিনি শহীদুল্লাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং তাকে কাছে ভিড়াতে পারবেন কি না? অথবা শহীদুল্লাহ্‌র পরিচিত মহলে গিয়ে শত চেষ্টা করেও তিনি 'বলীশ্বর'-কে খুঁজে পাবেন কি না? তাছাড়া এ-ও হতে পারে যে, এ নাম পরিবর্তনের জন্যে তিনি শহীদুল্লাহ্‌র বিরাগভাজনও হতে পারেন।

এ ছোট্ট পট-ভূমিকাটুকুর পরে অত্র নিবন্ধের শিরোনাম হিসাবে ব্যবহৃত শব্দত্রয়কে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য বাইবেল, ইঞ্জিল এবং সুসমাচার—এ শব্দ তিনটিই নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বা হয়ে আসছে। যদিও শব্দ তিনটি শোনার সাথে সাথে পৃথক পৃথক তিনটি নাম বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আসলে তা পৃথক পৃথক নয়—একটি গ্রন্থেরই তিন ভাষার তিনটি নাম।

নামের পরিবর্তন

যদিও গ্রন্থখানা 'বাইবেল' নামেই সুপরিচিত হয়ে পড়েছে অথবা সুপরিচিত করে তোলা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এর আসল নাম নয়। মূল গ্রন্থখানা হিব্রু ভাষায় লিখিত এবং উক্ত ভাষায় এর আসল নাম হল 'ইঞ্জিল'। ইংরাজী এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতঃ এর নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 'বাইবেল' এবং 'সুসমাচার'।

বলা বাহুল্য, ইঞ্জিল নামক গ্রন্থখানার যে কোন ভাষায় অনুবাদ হতে পারে, তা নিয়ে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যাকরণের সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতিকে লঙ্ঘন করতঃ অনুবাদের অজুহাতে প্রকৃত-পক্ষে মূল গ্রন্থখানায় উল্লিখিত আসল নামটির পরিবর্তন ঘটানোকে কোনক্রমেই সহজভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। কেননা, এটা শুধু অন্যায়, নিয়ম-বহির্ভূত এবং বিভ্রান্তিকরই নয়—রীতিমত ধৃষ্টতাজনকও। কেননা, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা যে গ্রন্থের নাম রাখলেন 'ইঞ্জিল' সে নামকে পরিবর্তন করতঃ বাইবেল বা সুসমাচার রাখাকে ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

আমার এ কথার সমর্থনে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলা যেতে পারে যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ত্রিপিটক, গীতা, জেন্দা-ভেস্তা প্রভৃতিও ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর বহু ভাষাতেই এসব গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু সকলের আসল নাম ঠিকই রয়েছে বা রাখা হয়েছে—কণামাত্র পরিবর্তনও ঘটানো হয়নি। কেননা, শুধু চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যাকরণের নিয়ম-নীতির প্রশ্নও এখানে রয়েছে। আর তা রয়েছে বলেই তাঁর দেয়া নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐসব ধর্মগ্রন্থের কোন ধারক এবং বাহকই তাঁর বিরাগভাজন হ'তে বা এত বড় ধৃষ্টতা দেখাতে চান নি—বিশ্ববিধাতার দেয়া পবিত্র নাম হিসেবে হাজার হাজার বছর ধরে অতীব শ্রদ্ধার সাথে তাঁরা সেই নামটিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

ভাষার পরিবর্তন

অন্যসব প্রশ্নকে বাদ দিয়েও এখানে বলা যেতে পারে যে, এ নাম পরি-বর্তনের সময়ে নাম রাখার সাধারণ নিয়ম-নীতিকেও নিদারুণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নাম রাখার এ সাধারণ নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আমরা ইতিপুর্বে বলেছি—নামটি অর্থপূর্ণ এবং নাম বস্তুর ও বস্তু নামের উপযোগী হতে হবে। তাছাড়া এমন অর্থপূর্ণ নাম রাখতে হবে, যাতে নাম শোনার সাথে সাথেই শ্রোতা নাম-ধেয় বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়।

এ সাধারণ নিয়ম-নীতিকে যে অতি অন্যায়ভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে 'সুসমাচার' নামটির মধ্যে আমরা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেতে পারি। বলা বাহুল্য, সুসমাচারের অর্থ হ'ল—ভাল সমাচার বা ভাল সংবাদ অর্থাৎ যে সমাচারের মধ্যে কু বা মন্দ সমাচার থাকতেই পারে না।

অথচ 'সুসমাচার' নামক এই গ্রন্থখানা পাঠ করলে তার মাঝে বহু 'কু' বা 'মন্দ' সমাচারও আমরা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ যীশুখৃস্টের ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে অতীব যন্ত্রণাদায়কভাবে মৃত্যু বরণের সমাচারটিকে তুলে ধরা যেতে পারে। একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সমাচারটি শুধু খৃস্টানদিগের কাছে নয়—বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মভীরু এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের কাছেই অতীব মর্মান্তিক একটি কু বা মন্দ সমাচার।

তারপরে ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক যীশুখৃস্টকে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করার যে সব সমাচার এ গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে, সেগুলোও যে সুসমাচার নয় নিশ্চিতরূপেই সে কথা বলা যেতে পারে।

যীশুখৃস্টের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম 'যীহুদা' ইহুদীদিগের সাথে ষড়যন্ত্র করতঃ সামান্য ত্রিশটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে যে ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং এ ধরিয়ে দেওয়ার ফলেই যে ইহুদীগণ তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিল, এবম্বিধ সমাচারটিও যে সুসমাচার বলে গণ্য হতে পারে না, সেকথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি। বলা-বাহুল্য, এমনি ধরনের বহু সংখ্যক কুসমাচারই তথাকথিত সুসমাচারটিতে রয়েছে। অতএব নামের সাথে বিষয়বস্তুর যে প্রচণ্ড ধরনের গড়মিল বিদ্যমান সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তাছাড়া যদি এসব কিছুকে সুসমাচার বলে ধরেও নেওয়া যায়, তথাপি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। কেননা 'সুসমাচার' শব্দটিই দ্ব্যর্থ-বোধক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শুধু বাইবেলই সুসমাচারবাহী একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। পৃথিবীতে বহু সংখ্যক ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে এবং সেগুলির মধ্যেও বহু সংখ্যক সুসমাচার রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থকেই যদি সুসমাচার বলা হয় তবে ওগুলিও সুসমাচার ব্যতীত নহে।

ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বহু সংখ্যক সু বা ভাল সমাচার বক্ষে ধারণ করতঃ ভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক গ্রন্থ এবং পুস্তক বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় সুসমাচার বলার সাথে সাথে বাইবেল বর্ণিত সুসমাচার বা বাইবেলের বাংলা সংস্করণটিকে সুনির্দিষ্টরূপে বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

অতএব কোন কিছুর নামকরণ করতে গিয়ে "শ্রোতা সাধারণ যাতে নামটি শ্রবণের সাথে সাথেই নাম-ধেয় বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারে" এ নিয়মটির কথাও যে এ নাম পরিবর্তনের সময়ে চিন্তা করা হয়নি সে কথা সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এসব কারণে প্রকৃতপক্ষে নাম রাখার উদ্দেশ্যই যে এখানে ব্যর্থ হয়েছে সে কথা দুঃখজনক হতে পারে কিন্তু মিথ্যা নয়।

অতীব দুঃখের সাথে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, স্বয়ং বিশ্বপতি 'ইঞ্জিল' নাম দিয়ে যে গ্রন্থখানাকে নাযিল বা অবতীর্ণ করেছিলেন, এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী শুধু সে গ্রন্থখানার নাম পাল্টিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি—স্বয়ং বিশ্ববিধাতার নামটিকেও পাল্টিয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁদের খেয়ালখুশীকে চরিতার্থ করেছেন। বিশ্ববিধাতার নিজস্ব নাম কি, সে সম্পর্কে তিনটি মাত্র প্রমাণের উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ক) ধর্ম-মন্দিরকে হিব্রু ভাষায় 'বয়ত-ইল' বলা হয়ে থাকে। 'বয়ত' অর্থ গৃহ এবং 'ইল' অর্থ আল্লাহ্ অর্থাৎ ইল বা আল্লাহর ঘর।

খ) আদি পুস্তকের (৩২ : ১২/৩০) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যাকোব (প্রবঞ্চক) ঈশ্বর বা সদাপ্রভুর সাথে যুদ্ধ করতঃ জয়ী হয়েছিলেন। ফলে সদাপ্রভু তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ইসরাইল'। উল্লেখ্য হিব্রু ভাষায় 'ইসরা' অর্থ —'যুদ্ধকারী' আর 'ইল' অর্থ আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধকারী।

(গ) বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, যীশুখৃস্টকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় তখন কাতর-কণ্ঠে আর্তনাদ করতঃ তিনি বলেছিলেন "এলী! এলী! লামা শিবক্তনী!" অর্থাৎ —হে আমার এলী! হে আমার এলী! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?[১]

বলা বাহুল্য, আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যে নামটি ধরে যীশুখৃস্ট তাঁর প্রভুকে ডেকেছিলেন সেটি প্রভুর আসল নাম ব্যতীত নহে। আর এই 'এলী' নামটি যে প্রভুর আসল নাম সে কথার সমর্থনে বলা যেতে পারে যে,—অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রভুর আসল নাম হিসাবে এল, এলোয়া, এলোহিয়া, এলোহীম, অল্ল, অল্লাহ্, আল্লা প্রভৃতি নাম প্রচলিত রয়েছে। আর এ নামগুলি সমার্থবোধক এবং এদের মূল ধাতুও অভিন্ন। এমতাবস্থায় বিশ্ব প্রভুর আসল নাম যে কি, সে কথা বুঝতে পারা কঠিন নয়। অথচ, সেদিকে কণা-মাত্রও দৃষ্টিপাত না করে উক্ত মহল নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করতে গিয়ে নামটির বুকে ছুরি বসাতে ত্রুটি করলেন না অর্থাৎ ইল বা আল্লাহ্‌র নাম রাখলেন 'গড'।

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, শুধু এ দু'টি নামকে স্বেচ্ছানুযায়ী পাল্টিয়ে দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। যাঁর মাধ্যমে ইঞ্জিল নামক পবিত্র গ্রন্থখানার অবতারণ ঘটানো হয়েছিল—সেই ইঞ্জিলের ভাষায় তাঁর নাম হ'ল ঈসা (আঃ)। অথচ, সেই ঈসা (আঃ)-র'ই তথাকথিত ভক্তগণ তাঁর নামটিকে পাল্টিয়ে দিয়ে ইংরাজী ভাষায় তাঁর নাম দিয়েছেন—'জিজাস' বা 'জিসাস' আর বাংলা ভাষায় 'যীশু'।

এখন বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী! নিজেরাই ভেবে দেখুন কিভাবে স্বয়ং বিশ্বপতি, তাঁর দেয়া ইঞ্জিলখানা এবং সেই ইঞ্জিলের যিনি বাহক অর্থাৎ যে তিনটি ছাড়া খৃস্টধর্মের অস্তিত্বই কল্পনা করা যেতে পারে না, সে তিনটি নামকে এমনভাবে পাল্টিয়ে দিয়ে খোদ খৃস্টধর্মের বুকেই ছুরিকাঘাত করা হয়েছে কি না।

আমরা মনে করি যে, প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতির প্রতি এমন চরম উপেক্ষা প্রদর্শন অর্থাৎ স্বয়ং বিশ্বপ্রভুর নাম—যে নাম একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভবই নয়—আর যে নামকে পবিত্র

---

১. খুব সম্ভব শব্দটি 'এলী' নয়—'ইলী'। কেননা, 'ইল' অর্থ প্রভু বা আল্লাহ্, আর 'ইলী' অর্থ আমার প্রভু বা আমার আল্লাহ্। —লেখক

ইঞ্জিলের মাধ্যমে স্বয়ং তিনিই ঘোষণা করেছেন, সে নামটির পরিবর্তন ঘটিয়ে যথাক্রমে ইংরাজীতে 'গড' এবং বাংলায় 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' রাখা, আর যে গ্রন্থখানাকে তিনি 'ইঞ্জিল' নাম দিয়ে নাযিল বা অবতীর্ণ করেছেন সে গ্রন্থখানার নাম পাল্টিয়ে যথাক্রমে বাইবেল ও সুসমাচার রাখা এবং সেই ধর্মের বাহক ঈসা (আঃ)-র নাম জিজাস এবং যীশু রাখার মত কাজকে কোন-ক্রমেই দূষণীয় এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ না বলে পারা যায় না।

তবে কোন স্বার্থের জন্যে বা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা এ কাজ করেছিলেন বলে মনে করা হলে হয়তো ভুল করা হবে। খুব সম্ভব, বিষয়টিকে ভালভাবে ভেবে না দেখা আর সে সময়ে ভালভাবে ভেবে দেখার মতো মন-মানস এবং পরিবেশ গড়ে না উঠার ফলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

ভাবের পরিবর্তন

এ নাম পরিবর্তনকে হয়তো অনুবাদ বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। অতএব অনুবাদের পরিণতি সম্পর্কে এখানে একটু আভাস দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ভাষায়ই এমন কতগুলি শব্দ থাকে যেগুলি একান্ত-রূপেই সে ভাষার নিজস্ব—অন্য কোন ভাষায় সেসব শব্দের হুবহু কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ওসব শব্দের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য এবং তাৎপর্যও থাকে। যত চেষ্টাই করা হোক, অন্য ভাষার কোন শব্দ দিয়ে এ বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য এবং তাৎপর্যকে যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না।

অন্য ধরনের গ্রন্থ বা পুস্তক-পুস্তিকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থ—যার ভাব, ভাষা, বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য, তাৎপর্য প্রভৃতি সব কিছুকে পরিপূর্ণরূপে সারাটি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে অনুবাদ পাঠ করে সে প্রয়োজন মিটতে পারে না—মিটানো সম্ভবই নয়। তাছাড়া অনুবাদকে মূল বা আসল মনে করা হলে শুধু ভুল এবং অন্যায়ই করা হয় না—নানারূপ বিভ্রান্তির শিকারেও পরিণত হতে হয়। আর হতে যে হয়, এলী বা ইলী, ইঞ্জিল এবং ঈসা (আঃ)—এই নামত্রয়ের ইংরাজী এবং বাংলা অনুবাদ থেকে ইতিপূর্বে সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

সংকলন-সংরক্ষণের ত্রুটি

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয় আর বিশ্বাস করা বা না করা হলো একান্তরূপেই মনের কাজ। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, কোন কিছু সম্পর্কে নিঃসংশয় ও নিঃসন্দিগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সহৃদয় পাঠকবর্গ হয়তো একথা বেশ সুস্পষ্ট-রূপেই বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বপ্রভু, তাঁর পবিত্র বাণী এবং সেই বাণীর যিনি বাহক অর্থাৎ যে তিনটির প্রতি সুগভীর এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি না হলে ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলা তো দূরের কথা, তার সূচনাই সম্ভব হতে পারে না, সে তিনটি নামেরই পরিবর্তন ঘটিয়ে জনমনে এক নিদারুণ সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ নামের পরিবর্তন বহু পরবর্তী ঘটনা। এতদ্বারা পবিত্র গ্রন্থখানার মৌলিকতাকে যে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে যে প্রকৃত ঘটনা যা-ই হোক, যেসব তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে একথা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, সূচনা থেকেই এ গ্রন্থখানার মৌলি-কতাকে ক্ষুণ্ণ করার কাজ শুরু হয়েছিল।

কিভাবে হয়েছিল এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। শুধু সহৃদয় পাঠকবর্গকে মোটামুটিভাবে একটা ধারণায় উপনীত হতে সাহায্য করার জন্যে কয়েকটি মাত্র তথ্যকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হ'ল।

পূর্বেই একথা বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় বাণীর যিনি বাহক অর্থাৎ বিশ্ব বিধাতা এই বাণী প্রেরণের জন্যে যাঁকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন, তিনি যদি লব্ধ বাণীসমূহকে যথাযথভাবে সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে যান তবে অন্য কারো পক্ষেই তা সম্ভব হতে পারে না। আশা করি, এই না পারার কারণ যে কি, তা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী অবশ্যই অনুধাবন করতে পারছেন। অতএব এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে অতঃপর বলতে হচ্ছে যে ঃ

বাইবেলের বর্ণনা যদি সত্য হয় (যদিও সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে আর কেন এবং কিভাবে রয়েছে, পরে সে তথ্য তুলে

ধরা হবে) তবে বলতে হয় যে, অকালে এবং আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল বলে যীশুখৃস্ট কর্তৃক ইঞ্জিলের সংকলন এবং সংরক্ষণের কোন উদ্যোগই গৃহীত হতে পারেনি।

এমন কি লব্ধ-তথ্য-প্রমাণাদি থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাঁর তিরোধানের পরবর্তী অর্ধ শতাধিক বছরেও তাঁর কোন শিষ্য, অনুচর বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক এ উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ফলে সূচনা থেকেই তার গোড়ায় গলদের সৃষ্টি হয়। আর এ গলদের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াসমূহ অত্যল্প-কাল মধ্যেই তার সারা অঙ্গে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

এ প্রতিক্রিয়াসমূহের স্বরূপ কি এবং কিভাবে তার মুকাবিলা করা হয়েছিল সে কথা পরে বলা হবে। প্রথমে দেখা যাক যীশুখৃস্টের মাধ্যমে সমাগত এ ধর্মীয় বাণীসমূহকে তাঁর তিরোধানের কতকাল পরে, কিভাবে এবং কার দ্বারা সংকলিত ও সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। আর এই ব্যবস্থার দ্বারা উক্ত গ্রন্থের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কিনা সাথে সাথে সে কথাও আমরা লক্ষ্য করে যাবো।

বাহুল্য বোধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে মোট ছত্রিশখানা ইঞ্জিলের মধ্যে বর্তমান বাইবেলে মাত্র যে চারখানা ইঞ্জিল সন্নিবেশিত রয়েছে, তার সংকলন ও সংরক্ষণের তথ্যই অতঃপর তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ প্রথমেই 'মথি' নামক ইঞ্জিলখানার কথা তুলে ধরতে হয়। কেননা, মথি যীশুখৃস্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য এবং শুধু খৃস্টান জগতেই নয়—অখৃস্টান বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের অনেকের কাছেই এ নামটি বিশেষভাবে পরিচিত। কথা প্রসঙ্গে 'মথি লিখিত সুসমাচার' বাক্যটির ব্যবহারও অনেকেই করে থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মথি নামক ইঞ্জিলখানা যে কোন ভাষায় কোন সময়ে রচিত হয়েছে সে কথা নির্দিষ্ট করে বলার মতো কোন প্রমাণই আমি খুঁজে পাইনি। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শত্রু কর্তৃক যীরুশালম -এর মন্দির ভস্মীভূত হওয়ার (৭০ খৃস্টাব্দ) অব্যবহিত পূর্বে তা রচিত হয়েছিল। (মথি ২৪ অঃ ১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। কোন কোন টীকাকারের মতে ৩৭ খৃস্টাব্দে, আবার কারো কোরো মতে ৬৩ খৃস্টাব্দ এর রচনা-কাল।

তবে ৪২—৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যে সুরীয় ভাষায় এর 'সারকথা' এবং ৩৬—৬৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে গ্রীক বা ইউনানী ভাষায় মথি নামক এ গ্রন্থখানা

রচিত হয়েছিল বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য মথির জনৈক টীকাকার তাঁর টীকার ১৮ পৃষ্ঠায় এ অভিমতকে খণ্ডন করে বলেছেন যে মূল ইঞ্জিলখানা যে কোন্ ভাষায় রচিত হয়েছিল সুনির্দিষ্টরূপে সে কথা বলার কোন উপায় নেই।

তা ছাড়া মথি যে যীশুখৃস্টের একজন শিষ্য ছিলেন, সে কথা স্বীকার করে নিলেও মথি নামক ইঞ্জিল খানার লেখক যে সেই মথিই অন্তত উক্ত ইঞ্জিলের ৯ম অধ্যায়ের ৯ম পদটি নিয়ে পর্যালোচনা করলে সে কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না।

বলা বাহুল্য, যে গ্রন্থখানার মৌলিকতা সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির এত সব কারণ রয়েছে তাকে অভ্রান্ত এবং ত্রুটিহীন, অন্য কথায় বিশ্বপ্রভুর বাণী বলে বিশ্বাস করার মতো কোন যুক্তি ইত্যাদি খুঁজে পাইনি।

০ এ কাজে অন্যতম উদ্যোগ গ্রহণকারী 'মার্ক' সাহেবও যীশুর শিষ্য ছিলেন না। যীশু সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু জানতেনও না। স্বীয় জননী এবং কতিপয় ব্যক্তির কাছে যীশু সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তাঁর লিখিত ইঞ্জিলে অর্থাৎ 'মার্ক'-এ তিনি তাই তুলে ধরেছেন। —(বাংলা টীকা ১৬১-১৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

মার্ক নামক এই ইঞ্জিলখানা কখন লিখিত হয়েছিল তার সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি। তবে কেউ কেউ অনুমানের উপরে ভিত্তি করে বলেছেন—৬৮ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ যীশুখৃস্টের অন্তর্ধানের ৩৫/৩৬ বছর পরে তা লিখিত হয়েছে।

মার্ক নামক এ ইঞ্জিলখানার সত্যতা এবং অভ্রান্ততা যে সন্দেহাতীত নয়, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। বাহুল্যবোধে সেগুলো পরিত্যক্ত হল। তবু একটি কথা না বলে পারছি না যে, এর উপসংহার ভাগটি যে মার্ক সাহেবের লিখিত নয় —সেকথা আধুনিক টীকাকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।
—(বাংলা অনুবাদের টীকা ২২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

০ 'যোহন' নামক ইঞ্জিলখানা যে যীশুর শিষ্য হাওয়ারী যোহন (ইউ-হোন্না)-এরই লিখিত সে কথার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণও আমি খুঁজে পাইনি। যোহন নামক অন্য এক ব্যক্তি তা লিখেছেন বলেই অনেকে বিশ্বাস পোষণ করেন। তা কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়েছে এ নিয়েও প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান।
—(বাংলা টীকা, ১ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অনেকে মনে করেন ৯৬ খৃস্টাব্দে তা সঙ্কলিত হয়েছে, আবার অনেকে একথা স্বীকার করেন না, (ঐ ২য় কলমের ১৮-২৫ ছত্রে দ্রষ্টব্য)। এর শেষ অর্থাৎ ২১ তম অধ্যায়টি যে যোহনের লিখিত নয়, প্রায় সকল টীকাকারই মুক্ত-কণ্ঠে সেকথা স্বীকার করেছেন। ---(ঐ, ঐ, ৩৭৬ এবং ৫৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

আর এ ইঞ্জিলখানা আসল যোহনের দ্বারা সঙ্কলিত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে---এত দীর্ঘ সময় পরে কোন্ কোন্ সূত্র থেকে তিনি যীশুখৃস্টের এ বাণীসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন, অথবা নিজের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেই তিনি এগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিনা? নিজের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি দিয়েছেন কি না, আর যদি কোন সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে তবে সে সূত্রগুলির নাম-পরিচয় কি এবং সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণই বা কি?

০ এ উদ্যোগ গ্রহণকারীদের অন্যতম 'লুক' সাহেবও যীশুর শিষ্য ছিলেন না। বিশিষ্ট খৃস্টানদিগের নিকট থেকে যীশু সম্পর্কে যে সব কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন সেগুলোকেই ৬৪ অথবা ৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ---(লুক-এর টীকা ২২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, যীশুর শিষ্য না হয়েও লুক সাহেবের এ উদ্যোগ গ্রহণ করার কারণ কি, তিনি নিজে বিশ্বাসী লোক ছিলেন কি না, যে সব ব্যক্তির নিকট থেকে পুস্তকের প্রতিপাদ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাদের নাম-পরিচয়ই বা কি এবং তাঁরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, এসব প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণই আমি খুঁজে পাই নি। সুতরাং লুক-এর ইঞ্জিলখানাকে অভ্রান্ত ও অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করার মতো কোন যুক্তিও আমি খুঁজে পাইনি।

ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, যেখানে ধর্মীয় বাণীর সংকলন ও সংরক্ষণে বাণী-বাহকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ অন্যথায় অন্তত তাঁরা প্রত্যক্ষ তত্বাবধানর একান্তরূপেই অপরিহার্য, সেখানে বাণী বাহকের তিরোধানে সুদীর্ঘকাল পরে যে উদ্যোগ গৃহীত হল, সে উদ্যোগ গ্রহণকারীদের চার জনের মধ্যে দু'জনই বাণী-বাহকের শিষ্য নন! আর বাকি দু'জনও আসল কি নকল সে সম্পর্কে রয়েছে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ।

তাছাড়া যেখানে যীশুর বাছাই করা এবং প্রথম শ্রেণীর বলে পরিচিত মাত্র দ্বাদশ জন শিষ্যেরই একজন সামান্য ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে যীশুকে

শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁর প্রাণদণ্ডের সুযোগ করে দিয়েছিল, অন্যজন বিপদের সময় যীশুকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল (মথি) সেখানে বাইবেল সঙ্কলক অন্যান্য শিষ্যাদিগের বিশ্বস্ততা সম্পর্কেই বা কি করে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যেতে পারে?

ইঞ্জিল সংকলনের সূচনাকাল থেকেই কিভাবে তার গোড়ায় গলদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই সে কথা বুঝাতে পারা যাবে। আর গোড়ার এ গলদ সারা দেহে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই যে তার মাঝে নানা ধরনের আবিলতার সৃষ্টি তথা অদ্ভুত-অলৌকিক কল্পকাহিনী এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত বিধি-নিষেধাদির সমাবেশ সম্ভব হয়েছে, আশা করি সে কথাও খুলে বলার প্রয়োজন হবে না।

দুটি স্বীকারোক্তি ও কয়েকটি অভিমত

তথাপি, বিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে আমার এ কথার সমর্থনসূচক যেসব স্বীকারোক্তির বিবরণ আমার কাছে রয়েছে, তা থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাত্রকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে। তা ছাড়া খৃস্টান জগতের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকেই এই আবিলতা সম্পর্কে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং করে চলেছেন তার যেগুলো সংগ্রহ করা সে সময়ে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার কতিপয়কেও এতদ্‌সহ তুলে ধরা হল।

০ খৃস্টান-জগতের সুপ্রসিদ্ধ সাধু স্বয়ং পল সাহেব বলেছেন: "আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁর গৌরবার্থে উপচিয়ে পড়ে, তবে আমি-ই বা এখন পাপী বলে আর বিবেচিত হতেছি কেন?" ---বাইবেল (রোমীয় ৩ ৭)

০ পল সাহেব তো সাধু মানুষ। তাঁর কথা ছেড়ে দিয়ে খৃস্টান "ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ বিশপ (Eusebius)-এর কথায় আসা যাক। স্বয়ং বিশপ (Eusebius) সাহেবের নিজের মুখের কথায় শুনুন। তিনি বলেছেন---I have related whatever might be rebounded to the glory and I have suppressed all that could tend to the disgrace of our religion. অর্থাৎ ---যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইতে পারে আমি সে সমস্তই বাইবেলে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি এবং যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব হানি হইতে পারে আমি সে সমস্তকেই গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।

—Christian Mytholgy Unveiled, Page 66

মিঃ ব্লণ্ডেল (Mr. Blondel) খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন—Whether you consider it the immoderate impudence of imposters, or the deplorable credulity of believers, it was a most miserable period and exceeded all others in pious frauds. —Do

—প্রতারকদিগের অপরিমিত ধৃষ্টতা কিংবা বিশ্বাসীদের শোচনীয় বিশ্বাস প্রবণতা, যাহাই বিবেচনা কর না কেন, সে এক অতীব শোচনীয় কালই ছিল, এবং তখন ধার্মিকতার জুয়াচুরি অপর সকল জুয়াচুরিকে অতিক্রম করিয়াছিল।

মিঃ ক্যাসাউবন (Casauban) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"..And whenever it was found the New Testament did not at all points suit the interests of its Priesthood, or the views of political rulers in league with them, necessary alterations were made, and all sorts of pious frauds and forgeries were not only common but justified by many of the fathers. —Do

—এবং যখনই দেখা যাইত যে, নূতন নিয়ম বাইবেল, তাহার পুরোহিত-দিগের স্বার্থের কিংবা তাহাদের দলস্থ রাজনৈতিক শাসনকর্তৃগণের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইতেছে না, তখনই তাঁহাদের আবশ্যক মত পরিবর্তন করিয়া দেওয়া এবং শুধু যে সকল প্রকার সাধুতার জুয়াচুরি কিংবা জালিয়াতি করাই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, বরং অনেক পুরোহিত কর্তৃক তাহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া প্রমাণও করা হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে আর একটিমাত্র মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি। মন্তব্যটি হল John William Burgon B. D. র।

তিনি তাঁর "The Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels" (এডওয়ার্ড মিলার এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৮৯৬, ২১১ পৃঃ) নামক পুস্তকে বাইবেলের এই বিকৃতি ঘটানোর বহু কারণের উল্লেখ করার পরে 'বিশ্বাসীদিগের ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত' শীর্ষক অধ্যায়ের ভূমিকায় লিখেছেন—These persons......evidently did not think it at all wrong to temper witn the inspired Text, if any expression seemed to (them to have a dangerous tendency, they altered it, or) transplanted it, or removed it bodily from the sacred page. About the immorality of the proceeding, they evidently did not trouble themselves at all, On the contrary the piety of motives seems

to have been held to constitute a sufficient excuse for any amount of license.

—"এই সকল লোক যে ধর্ম পুস্তকগুলিকে বিকৃত করা আদৌ কোন দোষের কাজ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা স্পষ্টত জানা যাইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের কোন উক্তি তাঁহাদের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইলে তাঁহারা তাহা বদলাইয়া দিতেন, তাহা স্থানান্তরিত করিয়া অথবা সম্পূর্ণ পদটি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া ফেলিতেন। .. ইহা যে নীতি বিগর্হিত অসৎ কার্য তাহা চিন্তা করার কষ্ট তাঁহারা আদৌ স্বীকার করিতেন না। বরং পক্ষান্তরে সাধু উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঐরূপ করা হইতেছে—এই খেয়ালকেই তাঁহারা নিজেদের কার্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।"

সঙ্কলন ও সংরক্ষণের ত্রুটি কিভাবে ইঞ্জিলের ভিত্তি বা মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং কত বেশী পরিমাণে করেছে আশা করি উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে। তারপর এই দুর্বল ভিত্তির উপরে গড়ে উঠা গ্রন্থখানার মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে এবং কত বেশী পরিমাণে গলদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে সে সম্পর্কীয় স্বীকারোক্তি এবং অভিমতের সংখ্যা আর না বাড়ালেও বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে তা বুঝতে পারা কঠিন হবে না বলেই আমি মনে করি।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বিশ্ব প্রভুর দেয়া বিধানটিকে এভাবে এক শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক কুক্ষিগত করে নেওয়া এবং তাঁদের বিচার-বিবেচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এর গোটা দেহটাই এক সময়ে গলদে গলদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং প্রাণশক্তিতে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করে ফেলে।

প্রতিক্রিয়া

ধর্মীয় বিধানের এই নিদারুণ অবস্থা যে তদানীন্তন কালের চিন্তাশীল মহলকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল করে তুলেছিল, সে কথা সহজেই অনুমেয়। আর এ অচল অবস্থার অবসানের জন্যে তাঁরা যে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এবং তা-ই যে স্বাভাবিক, সে কথা বুঝতে পারাও কঠিন নয়।

কিন্তু চঞ্চল এবং তৎপর হয়ে উঠলেও কাজটি ছিল যেমন কঠিন—তেমনই স্পর্শকাতর। অতএব সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর

ছিল না। তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে ইঞ্জিলের মধ্যে নানা ধরনের অদ্ভুত-অলৌকিক কল্পকাহিনী এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত ও যুক্তি-বিরোধী বিষয়াদির সমাবেশকে অন্যায় হলেও অপ্রত্যাশিত বলে আমি মনে করতে পারিনি। কেন পারিনি এবং ধর্মগ্রন্থখানাকে আবিলতা-মুক্ত করার কাজটিকে কেন কঠিন ও স্পর্শকাতর বলা হল সে সম্পর্কে দুটি কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। অন্যথায় বিষয়টিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অন্তত সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না বলেই আমার বিশ্বাস। অতএব সে সম্পর্কে দুটি কথা বলে তার পরে আমার মূল বক্তব্য শুরু করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

মানব শিশু ও শিশু মানব

ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা বা মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা অবশ্যই একথা জানেন যে, ব্যক্তিজীবনের মতো জাতীয় জীবনেও মানব জাতিকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি পর্যায়কে একে একে অতিক্রম করত বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হতে হয়েছে।

একদিন গুহা-জীবন থেকে যাত্রা শুরু করে আজ মহাশূন্যে পাড়ি জমানোর মধ্যেও এ ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট লক্ষণই আমরা দেখতে পাই।

মানব জাতির সেই শৈশবকালে তার মন-মানস যখন শিশুসুলভ জড়তায় আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন ছিল, তখন অদ্ভুত অলৌকিক কোন কিছু দেখলেই সে বিস্মিত অভিভূত হয়েছে—তার আড়ষ্ট আচ্ছন্ন এবং অপরিণত মনমানস দিয়ে সে সম্পর্কে একটা কিছু কল্পনা করে নিয়েছে।

এমনি ভাবেই কোন এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে যা কিছু তার কাছে অদ্ভুত-অলৌকিক বিবেচিত হয়েছে তার প্রতিই সে ঐশ্বরিক শক্তির আরোপ করেছে। অনুরূপভাবে যার কার্যকলাপে কিছুমাত্র অলৌকিকত্ব বা অসা-ধারণত্ব লক্ষ্য করেছে তাকেই স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরের সন্তান প্রভৃতি বলে ধারণা করে নিয়েছে। যত দূর জানা যায়—এ পর্যায়েই এমন একটা ধারণা তার মন-মানসে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে "অদ্ভুত, অলৌকিক যা নয়, তা ধর্ম হতে পারে না।"

অর্থাৎ ধর্ম বলতেই এমন সব বিষয়বস্তু এবং কার্যকলাপকে বোঝায় যা অদ্ভুত, অলৌকিক, হেঁয়ালীপূর্ণ, দুর্বোধ্য এবং মানবীয় ধ্যান-ধারণার

অতীত। বলা বাহুল্য, এ মানসিকতা থেকেই তারা একথাও ধারণা করে নিয়েছিল যে, যে মানুষের কার্যকলাপ যত বেশি অদ্ভুত-অসাধারণ এবং যত বেশি হেঁয়ালীপূর্ণ সে মানুষ তত বড় মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের তত বেশি অংশ তার মাঝে বিরাজমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের কার্যকলাপের মধ্যে এসবের অভাব রয়েছে মহাপুরুষ বলে বিবেচিত হওয়ার কোন যোগ্যতাই তাঁদের নেই।

যতদূর জানা যায়, এ সময়ে ধর্মীয় নেতা বা যাজক সম্প্রদায়ের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে—সাধারণ মানুষদের পক্ষে কোন কিছু, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা একান্তরূপেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরোধী; সুতরাং জঘন্য ধরনের পাপজনক এবং সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অতএব, এ প্রসঙ্গের উপসংহার টেনে বলতে হচ্ছে যে, সুদূরের সেই অতীতে ধর্ম এবং ধর্মগুরু সম্পর্কে শিশু-মানবদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে পড়া এসব ধারণা-বিশ্বাস-গুলো উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের বংশধরদের মধ্যবর্তিতায় চলে এসেছে।

যীশুখৃস্টের সময়ে অর্থাৎ আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বের মানুষ, বিশেষ করে যাজক সম্প্রদায় অর্থাৎ ধর্মীয় বিধানকে যারা নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির পরিচালনা ও বিধি-ব্যবস্থা প্রদান ও প্রণয়নে যাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের মন-মস্তিষ্ক-গুলি অতীতের এ সব ধারণা বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিল না।

আর যেহেতু এক শ্রেণীর যাজক বা পাদ্রী-পুরোহিতগণ সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই ইঞ্জিলকেই আদি, অকৃত্রিম, অভ্রান্ত এবং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত বাণী বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অতএব ইঞ্জিলকে আবিলতা মুক্ত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে এ কাজ শুধু কঠিনই নয়—বিশেষভাবে স্পর্শকাতর কাজ বলেও আমি মনে করেছিলাম। আমার এই মনে করা যথার্থ ছিল কিনা আশা করি বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সে কথা ভালভাবে ভেবে দেখবেন।

প্রতিকার প্রচেষ্টা

সংস্কারকামী ব্যক্তিদের পক্ষে সেদিন এ কাজ কত কঠিন ছিল সে কথা ভেবে দেখার জন্যে ইতিহাসের যাঁরা পাঠক তাঁদের মনকে একটিমাত্র ঘটনার প্রতি নিবদ্ধ করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ঘটনাটি ঘটেছিল এই ঘটনার প্রায় হাজার বছর পরে। অর্থাৎ তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল; মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে অন্ধকার ইউরোপেও যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বলে উঠেছে—কিছুসংখ্যক মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেছেন, ঠিক এমনি সময়ে পাদ্রী-পুরোহিতদের পক্ষ হতে এই অজুহাতে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কিছু চিন্তা করা একান্তরূপেই ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী কাজ। সুতরাং ধর্মের যারা গুরু, তাদের পক্ষে এই অন্যায় অসঙ্গত এবং ধর্মবিরোধী কাজকে কোন ক্রমেই চলতে দেওয়া সম্ভব নয়।"

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানা রয়েছে যে, এ বাধার ফলে অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আর যাঁরা তা করেন নি, তাঁদেরকে পাদ্রী-পুরোহিতদের দ্বারা শুধু ভীষণভাবে লাঞ্ছিতই হতে হয়েছিল না—অনেককে প্রাণও হারাতে হয়েছিল। অতএব, এ ঘটনার এক হাজার বছর আগে ইঞ্জিলের ভুলত্রুটি নিয়ে চিন্তা করা বা তার সংস্কার সাধনের কাজ যে কত বড় কঠিন এবং বিপজ্জনক ছিল সে কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাংগে

এবারে আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, এই অবস্থার জন্যে সংস্কারকামীদেরকে বাধ্য হয়েই 'সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাংগে' অর্থাৎ পশ্চাৎপন্থী এবং রক্ষণশীল পাদ্রী-পুরোহিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ যাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে না উঠে, আবার কাজটিও সম্পন্ন হয় এমন একটি পথ বেছে নিতে হয়েছিল। এই উভয় কুল বজায় রাখার জন্যে কাজটিকে যে তারা একটি 'দৈবঘটিত' কাজ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তাতে এক দিক দিয়ে সফলও হয়েছিলেন নিম্নবর্ণিত ঘটনা থেকে তা জানতে পারা যাবে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, ঈসা (আঃ) বা যীশুখৃস্টের মাধ্যমে অবতীর্ণ বাণীসমূহের সংখ্যা কত ছিল এবং সেগুলোকে গ্রন্থাকারে সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন কিনা সে কথা বলা আজ আর সম্ভব নয়। তবে এই বাণীসমূহকে যে সামগ্রিকভাবে ইঞ্জিল নামে অভিহিত করা হয়, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সে কথা জানতে পারা যায়।

যীশুখৃস্টের তিরোধানের পরে কতিপয় ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্নভাবে এই বাণীসমূহকে সংকলিত করার ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের সংখ্যা কত এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের সংকলিত ইঞ্জিল এবং গ্রন্থাদির সংখ্যাই বা কত সে কথা সুনির্দিষ্টরূপে বলার কোন উপায় নেই।

তবে Encyolopaedia Britanica, Art Aphocryphal literature শীর্ষক সন্দর্ভে ইঞ্জিলের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, ইঞ্জিলের মোট সংখ্যা ৩৬; 'প্রেরিতদিগের কার্য' ও 'শেষ প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত বাক্য' নামে দু'খানা পুস্তক এবং "প্রেরিতদিগের পত্র' আখ্যাত পত্রের সংখ্যা ১১৩। উল্লেখ্য যে, এই সমষ্টিই নতুন নিয়ম বা New Testament বলে পরিচিত।

কিন্তু বর্তমানে বাইবেল মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের নামেমাত্র ৪ খানা ইঞ্জিল ও উপরোক্ত দু'খানা পুস্তকসহ সর্বমোট ছ'খানা পুস্তক এবং ১১৩ খানার মধ্যে মাত্র ২১ খানা পত্র বিদ্যমান রয়েছে। নিদারুণভাবে এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ কি, সে সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে উপরোক্ত সংস্কারকামীদের সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি—তাঁরা তাঁদের এই সংস্কারের কাজটিকে 'দৈবঘটিত' কাজ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং এক হিসেবে কৃতকার্যও হয়েছিলেন। কি-ভাবে হয়েছিলেন অতঃপর সে কথাই বলা হচ্ছে।

শেষ পরিণতি

৩২৫ খৃস্টাব্দে নিকিও কাউন্সিলের এক অধিবেশন আহবান করা হয়।[১] উক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয় যে, ইঞ্জিলের পত্র-গুলিকে এলোমেলোভাবে বেদির উপরে ফেলে দেওয়া হবে, তাঁর মধ্যে যেগুলি বেদির উপরে টিকে থাকবে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হবে, আর যেগুলি বেদির বাইরে পড়ে যাবে সেগুলি জাল এবং মিথ্যা বলে পরিত্যক্ত হবে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী উপরোক্ত ৩৬ খানা ইঞ্জিল, দু'খানা পুস্তক এবং ১১৩ খানা পত্রকে বেদির উপরে এলোমেলোভাবে ফেলে দেওয়া হলে মাত্র ৪ খানা

১. Voltaire Quoted by Sir Syed, 6th Essay, 23 24.

ইঞ্জিল, ২ খানা পুস্তক এবং ২১ খানা পত্র বেদির উপরে টিকে থাকে এবং গ্রহণ-যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বিখ্যাত পোপ গ্লাসিওস (৪৯২-৪৯৬ খৃস্টাব্দ)-এর সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে সনদ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, এই নব বা অভিনব সংস্করণই প্রকৃত বা খাঁটি ঐশী বাণীরূপে সংস্কারকামী বা প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু হয়ে যায়। কি কারণে এঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট বলে পরিচিত হলেন অতঃপর সে সম্পর্কে দু'টি কথা বলা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, পশ্চাৎপন্থী এবং রক্ষণশীল পাদ্রী-পুরোহিত-গণ এই গলদে পরিপূর্ণ ইঞ্জিলকেই সাধারণের মধ্যে আদি, অকৃত্রিম এবং ঈশ্বরের মুখনিসৃত বাণী বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, প্রাচীনপন্থী খৃস্টানগণ 'রোমান ক্যাথলিক' বলে পরিচিত। আর যারা প্রাচীনপন্থীদের এ কাজের প্রোটেস্ট বা প্রতিবাদ করে ইঞ্জিলের সংস্কার সাধন করেছিলেন তাঁরা প্রোটেস্টান্ট বা প্রতিবাদকারী—অন্য কথায় বিরোধী সম্প্রদায় বলে পরিচিত হয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি মনে করি যে, রোমান ক্যাথলিক বা প্রাচীন পন্থীরা ভুল বুঝে অতীত গলদের বোঝা বয়ে চলেছেন আর প্রোটেস্টান্টগণও সেই গলদের বোঝাই বয়ে চলেছেন, তবে ভুল বুঝে নয়—ভুল করে। তাঁরা কি ভুল করেছেন এবং কিভাবে করেছেন (অবশ্য আমার বিবেচনায়) তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু সংক্ষেপে এটুকুই বলা যাচ্ছে যে ঃ

উপরোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সুদীর্ঘ ৩২৫ বছর ধরে ঈশ্বরের মুখনিসৃত বাণী বলে গৃহীত ও প্রচলিত ৩০ খানা ইঞ্জিল এবং ৯২ খানা পত্রকে মিথ্যা ও জাল বলে বাদ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু যে ৪ খানা ইঞ্জিল এবং 'প্রেরিতদিগের কার্য'---শীর্ষক একখানা ও 'শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত বাক্য' শীর্ষক একখানা—এই দু'খানা পুস্তক এবং ২১ খানা পত্রকে আসল ও খাঁটি বলে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যেও গলদের অন্ত ছিল না। আর এ ব্যবস্থা দ্বারা সেগুলোকে গলদ মুক্ত করাও সম্ভব ছিল না।

অবশ্য এ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁদের বোঝা যে কিছুটা হালকা হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে বোঝা হালকা হলেও তার প্রায় সবটাই ছিল গলদে পরিপূর্ণ।

সুখের বিষয় এই হালকা বোঝার মধ্যেও তাঁরা যে গলদের বোঝাই বয়ে চলেছেন এ কথাটা তাঁরা না হলেও তাঁদের পরবর্তী সময়ের অপেক্ষাকৃত উন্নত ও

চিন্তাশীল মানুষেরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ গলদ দুরী-করণের যথাযোগ্য পদক্ষেপও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কি পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন অতঃপর সে কথাই বলা হবে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে চিন্তাশীল এবং সংস্কারকামী খৃস্টান পণ্ডিত মণ্ডলী ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্যান্টনবেরী নগরে এই উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে, ১৬১১ খৃস্টাব্দে (প্রথম জেমস্-এর সময়ে) বাইবেল নাম দিয়ে ইঞ্জিলের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল, তার সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও নানাবিধ আবিষ্কার উদ্ভাবনের ফলে পুরাতন বাইবেলকে নিয়ে আর চলা যেতে পারে না।

অতএব, প্রয়োজনীয় সংস্কার-সংশোধন করে বাইবেলকে আধুনিক বা চলনোপযোগী করে তোলার জন্যে উক্ত সভার পক্ষ হতে ২৭ জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে চেষ্টা সাধনা করার পরে ১৮৮২ সালে বাইবেলের যে নতুন সংস্করণ বের করেন, তা-ই বর্তমান Revised Version বলে পরিচিত। এই কমিটি বাই-বেলের যে বিষয়গুলিকে এক বাক্যে মিথ্যা ও জাল বলে নির্ধারণ করেন মোটামুটিভাবে সেগুলি হ'ল ঃ

(ক) মৃত্যুর পরে যীশুর পুনর্জীবিত হওয়া, শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ ও স্বর্গস্থ পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণ।
—মথি ৬-২৩ এবং মার্ক ১৬-৯-২৩ পদ

(খ) স্বর্গীয় দূত কর্তৃক "বেথেস্‌দা' পুষ্করিণীর জল-কম্পন।
—যোহন ৫; ৩-৪ পদ

(গ) ব্যভিচারিণী নারীর বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ। —যোহন ৮-১১

(ঘ) যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের 'পুত্র'—এই বিশ্বাস। —প্রেরিত ৮-৩০

(ঙ) ত্রিত্ববাদ। —যোহনের ১ম পত্র, ৫-৭

উল্লেখ্য যে, এই Revised Version-ই বর্তমানে খৃস্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে গির্জার চার দেয়ালের মধ্যে শ্রদ্ধার বস্তু হিসেবে বিরাজমান রয়েছে। কেননা গির্জার বাইরে তার কোন কাজ নেই---কদরও নেই। আর এই কাজ এবং কদর না থাকার কারণ হল---এত কিছু করার

পরেও তার মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে গলদ রয়ে গেছে—যা থেকে তাকে মুক্ত করতে গেলে তার অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।

বলা বাহুল্য, যার গোড়া থেকে শুরু করে সারাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন গলদের ছড়াছড়ি তাকে গলদমুক্ত করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। আর পারে না বলেই খৃস্ট-সমাজকে বাধ্য হয়ে তাদের জীবনের সকল পর্যায় এবং সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে নিজদেরকে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' হতে হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, ধর্মনিরপেক্ষতার এই রক্ষাকবচ ধারণ করেও নানা কারণে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। ফলে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তাঁদেরকে ঘোষণা করতে হয়েছে—'ধর্ম একান্তরূপেই ব্যক্তিগত ব্যাপার।' সুতরাং তাকে মানা বা না মানা সেটা একান্তরূপেই নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে। অর্থাৎ যাঁর ইচ্ছা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সাত দিন পরে একবার গির্জায় গিয়ে হাযিরা দিয়ে আসবেন, আর যাঁর ইচ্ছা হবে না তিনি সারা জীবনে একবারও যদি গির্জায় না যান তবে সে জন্যে তাঁকে কারো কাছে কোন কৈফিয়তই দিতে হবে না।

বলা বাহুল্য, প্রকারান্তরে জীবনের সাথে ধর্মের পাঠ চুকিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে। আর করা হয়েছে একান্ত বাধ্য হয়েই। অর্থাৎ অচল ও বিকলাঙ্গ এই ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে চলা সম্ভব নয় বলেই।

আমার এই কথার সমর্থনে বর্তমান New Testament-এর মোটামুটি একটা পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে পূর্বোক্ত Aphocryphal literature নামক সন্দর্ভে যে ৩৬ খানা ইঞ্জিল ও ১১৩ খানা পত্রের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানগণ যেগুলিকে আসল ও অকৃত্রিম বলে মনে করেন, স্থানাভাব বশত সেগুলোর নাম এবং পরিচয়কে এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানগণ অর্থাৎ যাঁদের সংস্কারকামী বলে আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁরা ৩২৫[১] ও ১৮৭০ খৃস্টাব্দে মিথ্যা, জাল ও যুগের অনুপযোগী

---

১. ঘটনার বিবরণে প্রকাশ : পশ্চাৎপন্থী ও রক্ষণশীল পাদ্রী-পুরোহিত এবং তাঁদের সমর্থকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্যে সংস্কারকামীদেরকে এ সময় বাধ্য হয়ে মরা মানুষদের ভোটও নিতে হয়েছিল।

বলে বাদ দিয়ে ওসবের মধ্য হতে যে কজনকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানের New Testament (Revised Version) গড়ে তুলেছেন অগত্যা শুধু সে কয়টির নাম এবং পরিচয়ই এখানে তুলে ধরতে হলো। প্রথমে ইংরাজী ভাষায় এবং পরে বন্ধনীর মধ্যে বাংলা ভাষায় সেগুলোর নাম তুলে ধরা যাচ্ছে :

১। Mathew (মথি লিখিত সুসমাচার) ২। Mark (মার্ক ঐ) ৩। Luk (লুক্ ঐ) ৪। John (যোহন ঐ) এই চারখানা ইঞ্জিল। ৫। The Acts (প্রেরিতদিগের কার্যাবলী) ৬। Revelation (শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য)—এই দু'খানা মিলে মোট ছ'খানা পুস্তক।

১। Epistle to the Romans (রোমীয়দের প্রতি পৌলের পত্র) ২। Corinthians (১ম করিন্থীয় ঐ) ৩। Corinthians (২য় করিন্থীয় ঐ) ৪। Galations (গালাতীয় ঐ) ৫। Ephesians (ইফিসীয় ঐ) ৬। Philippians (ফিলিপীয় ঐ) ৭। Calossians (কলসীয় ঐ) ৮। Thessalonians (১ম থিসলনিকীয় ঐ)। ৯। Thessalonians (২য় থিসলনিকীয় ঐ) ১০। Timothy (১ম তিমথীয় ঐ) ১১। 2 Timothy (২য় তিমথীয়) ১২। Titus (তীতের প্রতি ঐ) ১৩। Philemon (ফিলিমনের প্রতি ঐ) ১৪। To the Hebrews (ইব্রিয়দের প্রতি ঐ) ১৫। Epistle of James (যাকোবের সাধারণ পত্র) ১৬। Peter (১ম পিতরের সাধারণ পত্র) ১৭। 2 Peter (২য় পিতরের ঐ) ১৮। John (১ম যোহনের সাধারণ পত্র) ১৯। 2 John (২য় যোহনের ঐ) ২০। 3 John (৩য় যোহনে ঐ) ২১। Jude (যিহূদার সাধারণ পত্র)। বিভিন্ন মণ্ডলীর নিকটে লিখিত এই ২১ খানা পত্র।

বলা বাহুল্য, এটাই ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ক্যান্টনবেরী কমিটি কর্তৃক ছাঁটাই-বাছাইকৃত বাইবেলের নতুন সংস্করণ বা revised version—যা সেই থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের মাঝে ভেজাল মুক্ত বাইবেল বা নির্ভেজাল সুসমাচার রূপে চালু রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ বেলায়ও কাজটিকে 'দৈবঘটিত' কাজ বলে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ ইঞ্জিল এবং পত্রের মুসাবিদাগুলি উপর থেকে এলোমেলোভাবে মৃত ব্যক্তির কবরের উপরে ফেলে দেওয়া হয়, এই অবস্থায় যেগুলি কবরের বাইরে পড়ে যায় সেগুলির প্রতি মৃত ব্যক্তির সমর্থন নেই বলে ধরে নেওয়া হয়। —Christian Mythology Unveiled দ্রষ্টব্য।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই কতগুলো প্রশ্ন মনকে ভীষণভাবে দোলা দেয়। স্থানাভাববশত তার সবগুলোর উল্লেখ এখানে সম্ভব নয় বলে মাত্র কয়েকটিকে নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(ক) ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে—উপরোক্ত চারখানা ইঞ্জিলের সাথে যে চার ব্যক্তির নাম জড়িত রয়েছে তাদের দু'জন যীশুর শিষ্য ছিলেন না এবং বাকি দু'জনও একই নামের ভিন্ন ব্যক্তি কি না তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তা ছাড়া তাঁদের সংগ্রহ এবং সংকলনের সূত্রও সন্দেহমুক্ত নয়। এমতাবস্থায় এগুলোকে নির্ভেজাল বলে মনে করা সম্ভব কি না?

(খ) যে পদ্ধতিতে (অর্থাৎ এলোমেলোভাবে বেদির উপরে ফেলে দিয়ে এবং মরা মানুষের ভোট নিয়ে) এ ইঞ্জিল চতুষ্টয়কে নির্ভুল নির্ভেজাল বলে অন্য ৩৬ খানা হতে পৃথক করা হয়েছিল তা সমর্থনযোগ্য তথা ভেজাল-মুক্ত করার নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ছিল কি না?

(গ) উপরোক্ত চারখানা ইঞ্জিল ছাড়া যে দু'খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র সত্য ও অভ্রান্ত বলে বর্তমান New Testaments (Revised version)-এ বিদ্যমান রয়েছে—নিশ্চিতরূপেই ওগুলো ইঞ্জিলের অংশ বা যীশুর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশে নয়—যীশুখৃস্টের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং অশিষ্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর খৃস্টধর্ম প্রচার সম্পর্কীয় কার্যাবলীর বর্ণনা বা সেই উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাবলী। এমতাবস্থায় ওগুলোকে পবিত্র ইঞ্জিলের অঙ্গীভূতকরণ ও ইঞ্জিলের সাথে সমমর্যাদাদান শোভন ও সঙ্গত হয়েছে কি না? আর এ কাজের দ্বারা ইঞ্জিলের পবিত্রতা এবং নির্ভরযোগ্যতাকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে কি না?

(ঘ) খৃস্ট-জগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যীশুর প্রাণ দান, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত হয়ে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ এবং স্বর্গীয় পিতার সিংহাসনে তারই ডান পার্শ্বে আসন গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা আজও New Testament (Revised version)-এ বিদ্যমান রয়েছে।

মার্ক ১৬ আঃ ১৯ পদ লুক ২৪—৫০

এ সব ঘটনা অলীক—অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কিনা সুধী পাঠকবর্গই সে কথা ভেবে দেখুন এবং ভেবে দেখুন যে, এগুলো যদি অলীক, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত হয় তবে উক্ত গ্রন্থখানাকে ভেজালমুক্ত বলে দাবি করা হলেও আসলে তা ভেজাল মুক্ত হয়েছে কি না?

(৪) যেহেতু ইঞ্জিলের বাণীসমূহ অবতারণের জন্যে বিশ্বপ্রভু একমাত্র যীশুখৃস্টকেই মাধ্যম হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, যেহেতু মৃত্যুর পরে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কোন সুযোগই থাকে না এবং যেহেতু মৃত্যুর পরে যীশুখৃস্ট এই পৃথিবী ছেড়ে সুদূরের সেই স্বর্গীয় পিতার আসনে গিয়ে বসেছিলেন—অতএব New Testament-এ বিদ্যমান উপরোক্ত ঘটনাসমূহকে যদি সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে সাথে সাথে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে—মৃত্যুর পরেও যীশুখৃস্টের প্রতি ইঞ্জিলের অবতারণ বন্ধ হয়নি এবং তিনি অতি সংগোপনে স্বর্গীয় পিতার সিংহাসন থেকে নেমে এসে পৃথিবীতে বিদ্যমান ইঞ্জিলের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর পরে সংঘটিত উপরোক্ত ঘটনাগুলো লিখে রেখে গেছেন। পক্ষান্তরে এগুলো যদি ভক্ত-ভাবুকদের কল্পনাপ্রসূত হয় আর সত্য বলে স্থান পেয়ে থাকে (আসলে হয়েছেও তা-ই) তবে এবারেও সুধী পাঠকবর্গ নিজেরাই ভেবে দেখুন ছাঁটাই-বাছাই করতে করতে মূল গ্রন্থের ছ'ভাগের পাঁচ ভাগ বাদ দেওয়া এবং তার পরেও দীর্ঘদিন ছাঁটাই-বাছাই অব্যাহত রাখার পরেও গ্রন্থখানা গলদমুক্ত হয়েছে কি না?

যেহেতু যীশুখৃস্টের মৃত্যু বা তিরোধানের সাথে সাথেই প্রত্যাদেশ অর্থাৎ ইঞ্জিলের অবতারণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তা-ই স্বাভাবিক, এমতা-বস্থায় যীশুখৃস্টের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বলে কথিত এসব ঘটনা কি করে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হলো এ নিয়ে পাঠকবর্গের মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। অতএব, বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে তা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

যীশুকে হত্যা করে হত্যাকারীরা তাদের এ কাজকে বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে তারা যীশুকে 'জারজ' 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'ভণ্ড' 'অভি-শপ্ত' প্রভৃতিরূপে জনমনে একটা ধারণা সৃষ্টির জন্যে জোর প্রচারণা চালাতে শুরু করে।[১]

স্বাভাবিক কারণেই বিরোধী মহলের এই প্রচারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে যীশু-সমর্থকদেরকেও জোর তৎপরতা চালাতে হয়। 'মানব

১. বাইবেল নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা হ'লেও এ সত্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠে; বহু খৃস্টান মনীষীও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে এই সত্যকে তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় প্রকাশঃ শত্রু পক্ষ যীশুভ্রমে অনুরূপ চেহারার জনৈক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায় এবং ক্রুশবিদ্ধ করে।

শিশু ও শিশু-মানব' উপশিরোনাম দিয়ে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে ঃ ধর্ম বলতেই যে অদ্ভুত অলৌকিক কার্যাবলীকে বোঝায় এবং যে ব্যক্তি এসব কাজে যত বেশি দক্ষ এবং যত বেশি তৎপর সে ব্যক্তি যে তত বড় মহাপুরুষ অথবা ঈশ্বরের অংশ, অবতার, সন্তান প্রভৃতির যে কোন একটা এমন ধারণা তদানীন্তন-কালের মানুষদের মন-মানসে শিকড় গেড়ে বসেছিল।

অতএব, যীশুখৃস্টের সমর্থকবৃন্দ এ সুযোগটিকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানোর অভিপ্রায়ে যীশুখৃস্টকে 'ত্রাণকর্তা', 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' 'অন্যতম ঈশ্বর' 'নানা ধরনের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যের অনুষ্ঠাতা' 'খৃস্ট-জগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণদানকারী,' 'মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভ করতঃ সশরীরে স্বর্গে আরোহণ এবং স্বর্গীয় পিতার সিংহাসনে তাঁরই ডানপার্শ্বে উপবেশনকারী' প্রভৃতি রূপে চিত্রিত করার জন্যে নানা ধরনের কল্প-কাহিনী রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তী কালের অতি-ভক্ত, অন্ধভক্ত, কপট বিশ্বাসী এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা এ সব কল্প-কাহিনীকে শুধু পবিত্র ইঞ্জিলের অন্তর্ভুক্তই নয়—বরং তার সাথে একাকার করে কার্যোদ্ধার অথবা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

অতঃপর একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে আবার নামের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে। পুনঃ পুনঃ নাম নিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্যে বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি আমার এ কাজকে ক্ষমা-সুন্দর চোখেই দেখা হবে।

নাম সম্পর্কে বলা আবশ্যক যে, ইঞ্জিল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল—'সুসংবাদ' বা 'শুভ সংবাদ'। আর বাইবেল (বাইবেল্) ও Testament শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে 'খৃস্টানদের ধর্ম পুস্তক' ও 'উইল' বা 'ইচ্ছাপত্র'।

অতএব, এটা বেশ সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ইঞ্জিল নামটির যে তাৎপর্য—বাইবেল ও টেস্টামেন্ট নাম দ্বারা সে তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না।

অবশ্য New Testament-কে 'গসপেলও' বলা হয়ে থাকে; আর বলা হয়ে থাকে যে, 'গসপেল' শব্দের অর্থ হল 'সুসমাচার'। বাইবেলের বাংলা সংস্করণের নামও যে সুসমাচার রাখা হয়েছে, ইতিপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। তবে বাইবেলে বহু সংখ্যক 'কু' বা দুঃখজনক সমাচার থাকার কারণে তার সুসমাচার নাম যে সঙ্গতিবিহীন এবং যথোপযোগী নয়, ইতিপূর্বে যথাস্থানে সে কথাও আমরা বলেছি।

বলা আবশ্যক যে, 'সুসংবাদ' এবং 'সুসমাচার' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে তা খুবই সূক্ষ্ম এবং সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। কিন্তু তাই বলে সুসমাচার অর্থকারীদের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে এ পার্থক্য বুঝেন না, এমন কথা কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমি মনে করি যে, বিশেষ একটি কারণে সাধারণ মানুষদেরকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা 'সুসংবাদ'-কে 'সুসমাচার' বলে প্রচার করেছিলেন, আর এ কাজে তাঁরা যে সফল হয়েছিলেন তার প্রমাণ হলো—আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত হবার পরেও সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাৎপর্যকেই অভ্রান্ত বলে ধরে রাখা হয়েছে।

পরবর্তী 'আসুন ভাল করে ভেবে দেখি' শীর্ষক নিবন্ধে অন্য কথার সাথে এ পার্থক্য সম্পর্কে বলা হবে বলে এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি করা হল।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে ঃ বিশ্ববিধাতা প্রদত্ত এ ধর্মগ্রন্থখানার এমন শোচনীয় অবস্থার কথা জানার পরে স্বভাবতই আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। (একজন ভুক্তভোগী এবং খৃস্টধর্মের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ থাকার কারণে এ বেদনার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশিই ছিল।) সাথে সাথে সে সব চিন্তাশীল এবং সংস্কারকামী খৃস্টান ভ্রাতাদের—যারা সে দিনের ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং নিকিও কাউন্সিলের বিখ্যাত অধিবেশনে গ্রন্থখানার ছ'ভাগের পাঁচ ভাগকে বাদ দিয়েও অতীতের অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী এবং পশ্চাৎমুখী কতিপয় মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভুলের সংশোধনে যত্নবান হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে যাঁরা ধরে রাখা সে ছ'ভাগের এক ভাগকে[১] গলদ মুক্ত করার জন্যে ক্যান্টনবেরীতে মিলিত হয়ে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাবও মনে জেগে উঠেছিল।

আজও আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি—শুধু তাই নয়, দু'হাজার বছর পূর্বে কতিপয় ব্যক্তির সংঘটিত ভুল এবং অজ্ঞতার ফসল রূপী এ অচল ও বিকলাঙ্গ ধর্মগ্রন্থখানাকে নিয়ে বিড়ম্বনা ভোগকারী নির্দোষ-নিরপরাধ খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মানসিক যাতনার কথাও আমি অন্তর দিয়ে অনুভব

১. ৩৬ খানা ইঞ্জিলের মাত্র ৬ খানা এবং ১১৩ খানা পত্রের মাত্র ২১ খানা রাখা হয়েছে। ফলে ছ'ভাগের পাঁচ ভাগকেই বাদ দেওয়া হয়েছে বলতে হবে।

করি। আর এ যাতনা অবসানের পথ যেন তাঁরা খুঁজে পান সে জন্যে বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশে আকুলভাবে প্রার্থনা জানাই।

এতক্ষণ ঈসা (আঃ) বা যীশু খৃস্টের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল অর্থাৎ যা New Testament বা সুসমাচার নামে চালু রয়েছে তার মৌলিকতা, সার্বজনীনতা এবং যুগোপযোগিতাকে কিভাবে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে তার কিছু পরিচয় তুলে ধরা হলো। পরবর্তী নিবন্ধসমূহেও আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কীয় আরও কতিপয় তথ্য তুলে ধরা হবে।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ যথাক্রমে তাওরাত ও যাবুরের নাম পরিবর্তনসহ বর্তমান অবস্থার কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

আদি পুস্তক বা Old Testament-এর আসল নাম 'তাওরাত' হযরত মুসা (আঃ)-র মাধ্যমে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। সাধারণত যেসব কারণে ধর্মীয় বিধানের গোড়ায় গলদের অনুপ্রবেশ ঘটে এসেছে তাওরাতের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

এ সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে—তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পরে হযরত দাউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে 'যাবুর' নামক গ্রন্থখানা অবতীর্ণ হয়েছিল। অতীতের সেই তাওরাত এবং পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ যাবুর এক সাথে সংকলিত করে বাংলা ভাষায় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আদিপুস্তক' এবং Old testament—উভয় ধর্মগ্রন্থকে একীভূত করা এবং নাম পরিবর্তনের দ্বারা তার মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে কি না বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর উপরেই সে কথা ভেবে দেখার দায়িত্ব অর্পণ করে এ মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্পর্কীয় দু'একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

ইহুদীদের রাজা সোলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে ইহুদী সম্প্রদায় ১২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের দু'টি দল যথাক্রমে এহুদা ও বেনয়ামিন সোলেমান (আঃ)-এর পুত্র বহাবিয়ামকে নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। অবশিষ্ট দশটি দল উত্তর দিকস্থ সামারিয়া নামক স্থানে গমন করে রাজধানী স্থাপন করে এবং গো-বৎসের পূজা শুরু করে দেয়।[১]

খৃস্টপূর্ব ৭২২ অব্দে আসিরিওগণ এ রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং ইহুদীদেরকে বন্দী অবস্থায় নিনেভায় নিয়ে যায়। কালক্রমে এ দশটি দল

১. ১ম রাজাবলী ১২ ঃ ১৮-৩০ পদ।

বা বংশ পৌত্তলিকদের সাথে লীন হয়ে পড়ে বা ইহুদী হিসেবে এদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে বহাবিয়াম প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিও খৃস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়নের রাজা বখতে-নসর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে তাওরাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র এবং অন্যান্য পবিত্র পদার্থ জেরুযালেম বা বায়তুল মোকাদ্দাস নামক মন্দিরে সংরক্ষিত হত।

এই আক্রমণে বখত-নসর রাজার নির্দেশে উক্ত মন্দিরটিতে অগ্নি সংযোগ করে তাওরাত ও পবিত্র দ্রব্যাদিসহ গোটা মন্দিরটিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করা হয়।

রাজ সৈন্যগণ বহু সংখ্যক ইহুদীকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করে এবং হত্যা বশিষ্ট নর-নারীদেরকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে যায়। অবশেষে খৃস্টপূর্ব ৫৩২ অব্দে পারস্যের রাজা কোরসের অনুগ্রহে বায়তুল মোকাদ্দাস মন্দিরটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। যে কোন কারণেই হোক, রাজা আর্তখস্তের সাহায্য লাভ করে বন্দী ইহুদীরা মুক্তি লাভ করে এবং বাবিলন হতে জেরুযালেমে ফিরে আসে। যে ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আর্তখস্তের সাহায্য লাভ সম্ভব হয়েছিল তার নাম ছিল ইস্রা বা আজরা। ইহুদীগণ জেরুযালেমে ফিরে আসার পরে এ লোকটি তাদের সম্মুখে কতগুলো কাগজপত্র উপস্থিত করেন এবং বলেন যে—এগুলোই মোশির ব্যবস্থা বা তাওরাত।[১]

একইরূপে প্রথম পঞ্চ-পুস্তক সংকলিত হওয়ার পরে নহিমিয়া নামক আর এক ব্যক্তি কতগুলো কাগজপত্র উপস্থাপিত করেন এবং বলেন—এটাই 'নবিম' নামক দ্বিতীয় ভাগের পুস্তকাবলী।[২]

এর পরে খৃস্ট পূর্ব ৬৮ অব্দে আন্তকিয়ার রাজা এন্টিনিউস ইহুদী জাতি ও তাদের ধর্ম শাস্ত্রগুলোকে চিরতরে ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে ইহুদী রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা শুধু মন্দিরটি এবং ধর্ম পুস্তকসমূহকে ভস্মীভূত করেই ক্ষান্ত হন নি—মুখে মুখে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার উপরেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

১. রাজাবলী ইস্রা ও নহিমিয়, ৭ম অঃ।
২. মাকাবিয় ২য় পুস্তক ২—১৩।

পক্ষান্তরে রাজার আদেশে জেরুযালেমের মন্দিরকে "জয়ীস' নামক দেবতার মন্দিরে পরিণত করা হয় মহা ধুমধামের সাথে, সেখানে উক্ত দেবতার পূজা চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে মাকাবী নামক জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে রাজা এন্টিউনিস পরাজিত হন। এভাবে স্ব-জাতিকে মুক্ত করার পরে উক্ত মাকাবী তাদের সম্মুখে কতগুলো বই-পুস্তক উপস্থাপিত করেন এবং বলেন—"এগুলিই আজরা এবং নহিমিয়া সংকলিত তোরাঃ ও নবিম।" শুধু তা-ই নয়, এ ব্যক্তি এর তৃতীয় ভাগ হিসেবে 'কাতবিম' নামক একটি ভাগকেও তার সাথে জুড়ে দেন।

অতঃপর ৭০ খৃস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর রোমান রাজ টাইটেস বা টাইটিউস ১৩৪ খৃস্টাব্দে কাইসর হেডরিন প্রমুখ কর্তৃক ইহুদী রাজ্য অধিকার, ধ্বংস যজ্ঞ চালানো, মন্দিরসহ তওরাতের যাবতীয় কাগজপত্রের ধ্বংস সাধন এবং জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক তওরাত নাম দিয়ে কতগুলো কাগজপত্র উপস্থিতকরণ প্রভৃতি ঘটনা পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির আশংকায় এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো না। এ সম্পর্কে অন্য তথ্যাদি অবহিত হওয়ার জন্যে আগ্রহী পাঠকবর্গকে 'Jewish Encyclopaedia' ১০ম খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ এবং rev. A. Streane কর্তৃক অনুদিত 'Chagiga Talmud'-এর ভূমিকা ৭৩৮ পৃঃ পাঠ করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং উপরোক্ত কার্যাবলী দ্বারা তওরাতের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা সে কথাও ভেবে দেখার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

অতঃপর উৎসাহী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সাথে তওরাত এবং যাবুরের বর্তমান অবস্থার কিছুটা পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন বোধ করছি। বিশেষ করে ইতিপূর্বে বাইবেলের শেষার্ধ অর্থাৎ New Testament বা বাইবেল নতুন নিয়মের মাঝে সন্নিবেশিত পুস্তক ও পত্রসমূহের উল্লেখ করার ফলে এখন সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যেই বাইবেলের প্রথমার্ধ অর্থাৎ Old Testament বা বাইবেল পুরাতন নিয়মের মাঝে সন্নিবেশিত পুস্তকাদির নাম করতে হচ্ছে। অন্যথায় বিষয়টা অনেকের কাছেই বেখাপ্পা ঠেকতে পারে। অতএব, যথাক্রমে তওরাত ও যাবুরের মাঝে সন্নিবেশিত পুস্তকাদির নাম প্রথমে ইংরাজীতে এবং পরে বন্ধনীর মধ্যে বাংলায় তুলে ধরা হল ঃ

১। Genesis (আদি পুস্তক), ২। Exodus (যাত্রাপুস্তক), ৩। Leviticus (লেবীপুস্তক), ৪। Numbers (গণনাপুস্তক), ৫। Deuteronomy (দ্বিতীয় বিবরণ)। উল্লেখ্য যে, এ পাঁচ খানা পুস্তক মোশী বা মূসা (আঃ)-র নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এগুলোকে 'মোশীর পঞ্চপুস্তক' বলা হয়ে থাকে।

৬। Joshua (যিহোশুর), ৭। Judges (বিচারক), ৮। Ruth (রূতের ইতিহাস), ৯। Samuel (১ম শামুয়েল), ১০। 2 Samuel (২য় শামুয়েল), ১১। Kings (১ম রাজাবলী), ১২। 2 Kings (২য় রাজাবলী), ১৩। Chronicles (১ম বংশাবলী), ১৪। 2 Chronicles (২য় বংশাবলী), ১৫। Ezra (ইস্রার পুস্তক), ১৬। Nehemiah (নহিময়), ১৭। Esther (ইস্টের পুস্তক)। এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোল্লিখিত 'পঞ্চপুস্তক' ব্যতীত এ তালিকার ৬—১৭ ক্রমিক সংখ্যায় যে ১২ খানা পুস্তকের নাম পাওয়া যাচ্ছে এর একখানাও মোশী বা মূসা (আঃ)-র নিকট অবতীর্ণ নয়।

যাবুর

১৮। Job (আইউব), ১৯। Psalms (গীত-সংহিতা বা দায়ূদের গীত), ২০। Proverbs (সুলেমানের উপদেশ), ২১। Ecclesiastes (উপদেশক) ২২। Song of Solomon (সলেমানের পরমগীত), ২৩। Isaiah (ইসায়াহ), ২৪। Jeremiah (যেরেমিয়াহ), ২৫। Lamentation (বিলাপ), ২৬। Ezekiel (যিহিস্কেল), ২৭। Daniel (দানিয়েল), ২৮। Hosea (হোশেয়), ২৯। Joel (যোয়েল), ৩০। Amos (আমোস), ৩১। Obadia (ওবদিয়া), ৩২। Habakkuk (হবক্কুক), ৩৩। Zephaniah (সিফনীয়), ৩৪। Haggai (হগয়), ৩৫। Zechariah (সখরীয়), ৩৬। Malachi (মালাখি)।

বলা বাহুল্য, যাবুর বলতে সামগ্রিকভাবে ৩৯ ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত এ ২২ খানা পুস্তককেই বোঝানো হয়ে থাকে যদিও একমাত্র 'গীত-সংহিতা' বা 'দায়ূদের গীত' ছাড়া আর কোন খানাই দায়ূদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় নি।

উল্লেখ্য যে, তওরাত এবং যাবুরের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যত সন্দেহ এবং যত মতভেদই থাক, মোশী বা মূসা (আঃ) এবং দায়ূদ (আঃ) এ উভয়েই যে প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলদের অন্যতম এবং বিশ্ববিধাতা-কর্তৃক যে তাঁদের উপরে যথাক্রমে তওরাত এবং যাবুর অবতীর্ণ হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা মতভেদ নেই।

এতদ্বারা আমি একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, মোশী বা মূসা (আঃ) এবং দাউদ (আঃ)-এর প্রতি যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল বিশ্ববিধাতা সুনির্দিষ্ট-রূপে সেগুলোকেই যথাক্রমে তওরাত এবং যাবুর নাম দিয়েছিলেন। অতএব, উপরোক্ত তালিকাদ্বয়ের প্রথমটিতে উল্লিখিত মোশীর 'পঞ্চ পুস্তক' এবং দ্বিতীয় তালিকায় 'গতি সংহিতা' বা 'দায়ূদের গীত' ছাড়া অন্য কোন পুস্তককেই যথাক্রমে তওরাত এবং যাবুর নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না অথচ তা-ই করা হয়েছে। আর সে কারণেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

অবশ্য অন্যান্য পুস্তকের কোন কোনটির সাথে কোন কোন নবী-রাসূলের নাম জড়িত রয়েছে। এ থেকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মোশীর পরে এবং যীশু-খৃস্টের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বনী ইসরাইলদের মধ্যে যেসব নবী-রসুল আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের লব্ধ প্রত্যাদেশ বা তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে—যেহেতু তওরাত বা যাবুরের অবতারণ এবং সংশ্লিষ্ট নবীদ্বয়ের তিরোধান এ উভয় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে ওসব নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটেছিল, অতএব তাঁদের কাছে অবতীর্ণ বাণীকে তওরাত বা যাবুর বলার কোন অবকাশ থাকে না।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, একমাত্র নবী-রসূলগণই ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার সংশোধন করতে পারেন; আর তা-ও করতে হয়—একান্তরূপেই বিশ্ববিধাতার নির্দেশক্রমে। এমতাবস্থায় যত জ্ঞানপ্রজ্ঞারই অধিকারী হোক না কেন, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এ কাজ করা যে শুধু অন্যায় এবং অসঙ্গতই নয়—ভীষণ ধরনের অনধিকার চর্চাও সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব পরবর্তী সময়ের এ সব বাণীকে যথাক্রমে তওরাত ও যাবুর বলে আখ্যায়িত করা বা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সাথে সংযোজনের এ ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিত না—যদি তা বিশ্ববিধাতার নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট নবী-রসূলদের কোন একজনের দ্বারা সম্পাদিত হতো। দুঃখের বিষয়, কাজটি তো সেভাবে হয়-ই নি বরং সংশ্লিষ্ট নবী-রসূলদের তিরোধানেরও বহু পরে অন্য মানুষেরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজটি সমাধা করেছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের এ কাজকে অন্যায়, অসংগত এবং ভীষণ ধরনের অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

সমধিক দুঃখজনক বিষয় হল—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে সমাগত এসব বাণীকে যথাক্রমে তওরাত এবং যাবুরের অঙ্গীভূত করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি—বর্ধিত কলেবরের এ তওরাত এবং যাবুরকে একত্র করে সামগ্রিকভাবে তার নাম দিয়েছেন 'আদিপুস্তক' 'বাইবেল পুরাতন নিয়ম' বা 'Old Testaments'.

এ-ই তো হল নানা মুনির নানা মতের সংযোজন ও নাম পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ববিধাতা প্রদত্ত এ গ্রন্থদ্বয়ের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার বহু কারণের একটি। অতঃপর আসুন, এ মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আরেকটি মাত্র কারণের উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করি।

এ বাইবেল পুরাতন নিয়ম বা Old Testaments-এর স্থানে স্থানে এমন বহু পুস্তকের নাম পাওয়া যায়—যেগুলোর অস্তিত্বই ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কতিপয় পুস্তকের নাম এবং যে সব পুস্তকে উক্ত নাম রয়েছে পরে বন্ধনীর মধ্যে সেগুলোর নাম এবং পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

ক) শোলোমনের "তিন সহস্র প্রবাদবাক্য ও এক সহস্র পাঁচটি গীত (১ম রাজাবলী ৪—৩২); খ) শোলোমনের বৃত্তান্ত পুস্তক (ঐ ১১—৪২), গ) মোশীর নিয়ম পুস্তক (যাত্রা পুস্তক ২৪ ঃ ৭); ঘ) সদাপ্রভুর যুদ্ধ পুস্তক (গণনা পুস্তক ২১, ২৪); ঙ) যাশের পুস্তক (যিহোশূর ১০—১৩); চ) নাথন ভাববাদীর পুস্তক (২ বংশাবলী ৯—২৯); ছ) শীলোনীয় অহিয়ের ভাববাণী—(ঐ); জ) ইদ্দোদর্শকের পুস্তক (ঐ); ঝ) হানানির পুত্র যেহূর পুস্তক (বংশাবলী ২০—৩৪); ঞ) আমোসের পুত্র যিশাইর ভাববাদীর পুস্তক (ঐ ২৬; ২২;) ইত্যাদি।

এতগুলো পুস্তক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মূল গ্রন্থের কতখানি ক্ষতি হয়েছে সে কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত 'ভাববাদীদের' পুস্তকগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখা।

কেননা, এদের অনেকেই নবী-রাসূল ছিলেন না। অতএব, নিছক ভাবের উচ্ছ্বাস ছাড়া বিশ্ববিধাতার সাথে তাঁদের যে কোন যোগসূত্র ছিল না সে কথা সহজেই অনুমেয়। এমতাবস্থায় সেসব ভাববাদী নিছক ভাবের উচ্ছ্বাসে যে সব কথা বলেছেন সেগুলোকে কোনক্রমেই নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সমাগত পবিত্র বাণীর সমতুল্য মনে করা যেতে পারে না। অথচ সমতুল্য মনে করা

হয়েছে—আর মনে করা হয়েছে বলেই সেগুলোকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত করে নিতে দ্বিধাবোধও করা হয়নি।

আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে অতঃপর অনায়াসেই একথা বলা যেতে পারে যে, এমনিভাবে মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই এ ধর্মগ্রন্থটি সম্পর্কে জনমনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অন্য মানুষ তো বটেই, খোদ ইহুদী সম্প্রদায়ই যে এ বিভ্রান্তির করুণ শিকারে পরিণত হয়ে বিবদমান নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তার দু'একটি প্রমাণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

এঁদের বিবদমান প্রধান দু'টি দলের নাম যথাক্রমে 'সাদুকী' ও 'ফরিশীয়'। সাদুকীদের কথা হল—"মোশীর পঞ্চ পুস্তক ছাড়া অন্য কোন পুস্তক আমরা মানি না। কেননা, অন্যগুলো Revelation বা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী নয়।"

পক্ষান্তরে ফরিশীয়দের মতে—'তোরা' অর্থাৎ 'তওরাত' দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ—'লিখিত ঐশী বাণী'। মোশীর 'পঞ্চ পুস্তক' এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 'বাচনিকভাবে রক্ষিত ঐশী বাণীসমূহ'—অতএব সবই মানতে হবে।

এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ সাদুকীদের যুক্তি হল—"ঐশী বাণী হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অলিখিত অবস্থায় ওগুলো হারূন ও তাঁর বংশধরগণ কর্তৃক হৃদয়াভ্যন্তরে সংরক্ষিত হওয়া অবশেষে এ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তি ইস্রা কর্তৃক যাজকমণ্ডলীর হৃদয়ে স্থানান্তরিতকরণ, প্রায় তিনশ বছর পরে যাজকমণ্ডলীর শেষ ব্যক্তি শামাউনের নিকট থেকে তা 'ছফরীম' বা ধর্মগ্রন্থ লেখকগণ এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের নিকট থেকে 'তানা-এম' বা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে স্থানান্তরকরণ প্রভৃতি কারণে নানারূপ জাল এবং ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটায় ওগুলোর মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় জাল এবং ভেজালের বোঝা বয়ে পণ্ডশ্রম করার কোন মানেই হয় না।"

বলা বাহুল্য, দিনে দিনে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির এমনি বহু কারণই ঘটে গেছে। এ নিয়ে আর বেশি উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে আলোচনার অঙ্গহানি হবে বলে একান্ত বাধ্য হয়েই পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে শেষবারের মতো আমাকে আবার নামের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ভাষারই এমন কতগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দ রয়েছে—যেগুলোর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য বিদ্যমান; অন্য কোন ভাষায় সেগুলোর হুবহু কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। নামের বেলায় এ বিষয়টি সমধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। সে কারণে এক ভাষার কোন বাক্যকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে—নামটিকে অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তিত রাখা হয়। ব্যাকরণের চিরাচরিত নিয়মও এটা-ই।

অথচ এ নিয়ম-নীতিকে সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করে তওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিল—এ তিনটি নামেরই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। যার ফলে জনমনে শুধু নিদারুণ বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়নি—গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকতাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'তওরাত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল—'জ্যোতি' 'আলো', 'স্তোত্র' 'পরমগীত' 'গীতসংহিতা' প্রভৃতি। আর 'যাবুর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য 'স্তোত্র', 'বন্দনাগীতি', 'স্তবমালা' প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে 'আদিপুস্তক' শব্দের তাৎপর্য 'প্রথম পুস্তক' হলেও এটাই যে বিশ্বের প্রথম পুস্তক দৃঢ়তার সাথে সে কথা বলা যেতে পারে না। তাছাড়া মূল তওরাত বা 'মোশীর পঞ্চ পুস্তক'কে যদি বিশ্বের প্রথম বা আদিপুস্তক বলে ধরেও নেওয়া হয়, তথাপি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। কেননা, মূল তওরাত বা মোশীর পঞ্চপুস্তক ছাড়াও পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত কতিপয় নবী-রসূল ও তথাকথিত 'ভাববাদী' বা সাধু-সজ্জনদের বাণী তাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়—মোশীর তিরোধানের বহুকাল পরে দায়ূদের প্রতি অবতীর্ণ যাবুরকেও তথাকথিত আদিপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যাবুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—দায়ূদের পরে এবং যীশুখৃস্টের পূর্বে সমাগত নবী-রাসূলগণ এবং তথাকথিত ভাববাদী ও সাধু-সজ্জনদের বাণীকে।

এমতাবস্থায় কয়েক হাজার বছরে বহুসংখ্যক নবী-রসূল, ভাববাদী ও সাধু-সজ্জনদের মাধ্যমে লব্ধ প্রায় অর্ধশতাধিক পুস্তক নিয়ে তাও আবার অনধিকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গড়ে তোলা এ নব বা অভিনব সংস্করণকে 'আদিপুস্তক' নাম দেওয়ার কতটুকু যৌক্তিকতা থাকতে পারে এবং জ্যোতি, আলো, বন্দনাগীতি, স্তবমালা অর্থাৎ তওরাত ও যাবুরের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যের

সাথে 'আদিপুস্তক' শব্দের কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে সে কথা গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ সমীপে সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

অনুরূপভাবে আদিপুস্তকের ইংরেজী নাম অর্থাৎ Old Testament শব্দের অর্থ হল 'পুরাতন নিয়ম', 'পুরাতন উইল' বা 'পুরাতন ইচ্ছাপত্র' এ 'নিয়ম' 'উইল' বা 'ইচ্ছাপত্রের' সাথে মূল নামের তাৎপর্য অর্থাৎ জ্যোতি, আলো, বন্দনাগীতি, স্তবমালা প্রভৃতির সামান্যতম মিলও রয়েছে কিনা আশা করি বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সে কথাও গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

উপরের এ আলোচনা থেকে একথাও বুঝতে পারা সহজ যে, মোটামুটি-ভাবে এই গ্রন্থত্রয় অর্থাৎ তওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল যথাক্রমে জ্যোতি বা আলো, স্তবমালা বা বন্দনাগীতি এবং সুসংবাদ বা শুভ সংবাদ।

অথচ, এ গ্রন্থত্রয়কে একত্রীভূত করে সামগ্রিকভাবে নাম দেওয়া হয়েছে—ইংরেজীতে 'বাইবেল' এবং বাংলা ভাষায় 'সুসমাচার'। এখন বিশ্বপতির দেয়া নাম এবং মানুষের দেয়া নামের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি না এবং বিশ্ব-পতির দেয়া ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নামকে নস্যাৎ করে নিজেদের ইচ্ছামত গ্রন্থত্রয়কে একত্রীভূতকরণ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্য প্রকাশক একটি নামে মাত্র অভিহিত করার এ কাজ সঙ্গত এবং সমর্থনযোগ্য কি না আর এতদ্বারা গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকতাকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে কি না সে কথা ভেবে দেখার দায়িত্ব বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল পাঠকবর্গের উপরে ছেড়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি।

সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতা

সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই লক্ষ্য রেখেছেন যে, এতক্ষণ বাইবেলসহ তওরাত ও যাবুরের মৌলিকতা সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অতএব, আমার অনুসন্ধানের তিনটি বিষয়ের বাকি দুটি অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টধর্মের সার্বজনীনতা এবং যুগোপযোগিতা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

তবে আলোচনা দীর্ঘায়িত করে ইতিমধ্যেই অনেকের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ ঘটিয়েছি। তাছাড়া পুস্তকের কলেবরও আন্দাজের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অগত্যা বাধ্য হয়েই সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিতে হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ইঞ্জিলের শিক্ষা কি ছিল—আজ আর সুনির্দিষ্টরূপে সে কথা জানার উপায় নেই। অতএব, বর্তমান বাইবেল এবং

তার অনুসারীদের কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে যতটুকু জানা সম্ভব ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

(ক) বাইবেলের অনুসারী অন্যদের কথা ছেড়ে দিয়ে আজ যেসব দেশ জ্ঞানে-গুণে, অর্থে-সম্পদে এবং প্রজ্ঞায়-প্রতিভায় সারা বিশ্বের সেরা বলে পরিচিত, সেসব দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও দেখতে পাওয়া যাবে যে—তথাকার কৃষ্ণাঙ্গ খৃস্টানগণ একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র গাত্রচর্ম কালো হওয়ার অপরাধে (!) তথাকার গৌরাঙ্গ খৃস্টানদের গির্জা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, প্রেক্ষাগৃহ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোনটাতে প্রবেশাধিকার তো পাচ্ছে-ই না বরং ওসবের আশেপাশে গেলেও তাদেরকে কুকুর-শৃগালের মত ঘৃণিত, লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় সে ধর্মের সার্বজনীনতা সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

(খ) একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, একের ধর্ম-মন্দিরে অপরের প্রবেশাধিকার না থাকা, এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থকে মিথ্যা, জাল ও ভেজালের সমষ্টি বলে মনে করা, বিশেষ করে নবদীক্ষিত খৃস্টানদেরকে 'নেটিভ' আখ্যা প্রদান করে ঘৃণার চোখে দেখা এবং সমানাধি-কার না দেওয়া প্রভৃতি কার্যকলাপও যে সার্বজনীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী, আশা করি সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হবে না। এ দু'টি মাত্র বাস্তব নিদর্শনের পরে আসুন বাইবেলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিঃ

(গ) বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশঃ স্বয়ং ঈশ্বরই না কি যীশুখৃস্টের মাধ্যমে বলেছেন—"ইসরাইল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আমি কাহারও জন্য প্রেরিত হই নাই।" —মথি ১৫ঃ২১—২৮

"তোমাদের পবিত্র বস্তু (ধর্ম) শূকরদের (অন্য ধর্মাবলম্বীদের) সম্মুখে ফেলিও না, পাছে তাহারা উহাকে পা দিয়া দলায় এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাঁড়িয়া ফেলে।"

—ঐ

"সন্তানদের (ইসরাইলদের) খাদ্য (ধর্ম) কুকুরদের (অন্য ধর্মাবলম্বী-দিগের) সম্মুখে দেওয়া উচিত নয়।"

—ঐ

আশা করি, খৃস্টধর্মের সার্বজনীনতা সম্পর্কে আর কোন উদ্ধৃতি তুলে ধরা বা কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন হবে না। তবে এখানে যে কথাটি বলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি তা হলো ঃ

এ বিশ্ব নিখিলের যিনি স্রষ্টা, প্রভু এবং প্রতিপালক সকলের ব্যবস্থা-পকও যে তিনি-ই সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আর এ প্রতিপালন এবং ব্যবস্থাপনা তো বটেই, অন্য কোন ক্ষেত্রে এবং অন্য কোন অবস্থায়ই তিনি যে কারো প্রতি কোনরূপ অন্যায়, অবিচার এবং পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না, সে সম্পর্কেও কোনরূপ দ্বিমত নেই—থাকতে পারে না। সাধারণভাবে মানবকল্যাণ এবং বিশেষভাবে পাপী ও পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে সৎপথ প্রদর্শনই যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্তত তা ই যে হওয়া উচিত সে কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এমতাবস্থায় সেই মহান প্রভু কিভাবে বিশ্বের কোটি কোটি পাপী ও পথভ্রষ্ট মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্রও না করে শুধুমাত্র ইসরাইলকুলের হারানো মানুষদের পক্ষপাতী হতে পারেন— কিভাবে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে তার ধর্ম-রূপ পবিত্র বস্তুটি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এবং কিভাবে অন্য ধর্মের মানুষদেরকে পাইকারীভাবে কুকুর-শূকর প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করতে পারেন বহু চেষ্টা করেও সে কথা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

তাছাড়া স্বয়ং ঈশ্বর যেখানে উপরোক্ত তিন তিনটি নির্দেশের মাধ্যমে তাঁর ধর্মরূপ পবিত্র বস্তুটিকে তথাকথিত কুকুর-শূকর অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচার-প্রতিষ্ঠা বা বিলি-বন্টন তো দূরের কথা তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাকেও এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং এ বিলি-বন্টনকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তান বা একমাত্র ইসরাইলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন—সেখানে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ কোন্ সাহসে এবং কোন্ যুক্তিবলে ঈশ্বরের এ সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করে খৃস্টধর্মরূপ পবিত্র বস্তুটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথাকথিত কুকুর-শূকর অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে চলেছেন? অতীব লজ্জা এবং দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, প্রায় সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী যাবত যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর আমি পাই নি।

হয়তো 'ত্রাণকর্তা' যীশু তাঁদের অর্থাৎ গোটা খৃস্টান জগতের "যাবতীয় পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন" এ বিশ্বাসের বলেই তাঁরা এমন

ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সাহসী হয়েছেন, তবে অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু ধর্মের প্রেরণায় নয়, বরং নিজেদের 'বিশেষ উদ্দেশ্য' সিদ্ধির মতলবেই তাঁরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন—অতএব, এর ফলও তাঁদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাইবেলের যুগোপযোগিতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু লেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কেননা, যুগোপযোগিতা না থাকার জন্যে খোদ খৃস্ট সমাজই যে পুনঃ পুনঃ তার সংস্কার-সংশোধনের কাজ চালিয়ে এসেছেন, ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে বহু তথ্য-প্রমাণই তুলে ধরা হয়েছে। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে ইহুদী সম্প্রদায় এবং পরে খৃস্টান সম্প্রদায় উপশিরোনাম দিয়ে দু'টি নিবন্ধ তুলে ধরা যাচ্ছে।

ইহুদী সম্প্রদায়

বিরুদ্ধবাদী রাজশক্তি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ ইহুদী রাজ্য আক্রান্ত হওয়া এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর ফলে অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও পবিত্র তওরাত গ্রন্থ যে বহু পূর্বেই পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ইতিপূর্বে যথাস্থানে তুলে ধরে হয়েছে।

বর্তমানে আদিপুস্তক বা Old Testament নামে যে পুস্তক খানা চোখে পড়ে তাকে তওরাত বলে মন্তব্য করা হলেও তা যে আসল তওরাত নয়, সে কথাও সেখানে বলা হয়েছে। সাথে সাথে তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে একথাও বলা হয়েছে যে, আসল তওরাত ভস্মীভূত হওয়ার পরে তদানীন্তন কালের পাদ্রী-পুরোহিতগণ সত্য-মিথ্যা, আন্দাজ, অনুমান, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি এবং প্রাচীন কালের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কিসসা-কাহিনী অবলম্বনে যে অভিনব পুস্তক রচনা করে তওরাত নাম দিয়ে জোর করে সমাজের বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, বর্তমানে তা-ই আদিপুস্তক বা Old Testament নামে বিদ্যমান রয়েছে।

এ নকল তওরাত অর্থাৎ বর্তমানের আদিপুস্তক বা Old Testament -এর সাহায্যে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিশ্বপ্রভুর সত্যিকারের পরিচয় জানা এর কোনটা-ই যে সম্ভব হতে পারে না; পুস্তক-খানা পাঠ করার সাথে সাথেই সে কথা আমি সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পেরে-ছিলাম। বিশ্বপ্রভুর পরিচয় সম্পর্কীয় যেসব বিবরণ আমার এ বুঝতে পারার

কাজে সহায়ক হয়েছিল পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে তার মাত্র কয়েকটিকে নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(ক) আদি পুস্তকের বর্ণনায় প্রকাশঃ এক রাত্রিতে যাকোবকে একাকী পেয়ে সদাপ্রভু (ঈশ্বর) তার সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁকে কাবু করতে পারছিলেন না। অগত্যা সদাপ্রভুকে যাকোবের উরু-দেশে প্রচণ্ড আঘাত করতে হয়, যার ফলে যাকোবের উরুদেশের হাড় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এতেও কোন ফল হয় না বরং যাকোবের কুক্ষি থেকে সদা-প্রভুর নিষ্ক্রমণই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে যায়। অগত্যা যাকোবের কাছে নতি স্বীকার করতঃ ঈশ্বরের পক্ষে প্রভাতের পূর্বে অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করা সম্ভব হয়।

—আদি পুস্তক ৩০ অঃ ২২-৩০ পদ

(খ) মিসরীয় প্রতিবেশীদিগের বস্ত্র ও মূল্যবান অলংকারাদি চুরি করার জন্য ঈশ্বর ইসরাইলদিগকে আদেশ দিয়েছিলেন।

—ঐ ৩ অঃ ২২ পদ

(গ) ফেরাউন রাজার দোষে অর্ধ রাত্রিতে ঈশ্বর নেমে আসেন এবং মিসরের সমস্ত মানুষ ও পশুদিগের প্রথম-জাত সন্তান ও শাবকদিগকে সংহার করেন।

—ভু ১২ অঃ ২০ পদ

(ঘ) ইসরাইল বংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বচক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং মুখামুখি তাঁর সাথে তাদের কথোপকথন হয়।

ঐ— ২৪ অঃ ৯—১০ পদ

(ঙ) বিশ্বপ্রভু সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা-বিশ্বাস ছাড়াও হঠকারী স্বভাব, কৃপণতা, কুসীদ গ্রহণ, সর্বোপরি পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতঃ সুবর্ণ নির্মিত গো-বৎসের পূজায় আত্মনিয়োগ প্রভৃতি ঘটনা ইহুদী সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্যে কলংকিত করে রেখেছে।

খৃস্টান সম্প্রদায়

পিতা (স্বয়ং ঈশ্বর), পুত্র (যীশু) এবং পবিত্রাত্মা (জিবরাইল) এ তিন জনের প্রত্যেককে একেক জন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর বলে কল্পনা করেই যে পাদ্রী পুরোহিতগণ সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন না—এ তিনজন স্বতন্ত্র ও

স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বরকে যে আবার একত্রে একজন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বররূপে কল্পনা করে নিয়ে এক অতি দুর্বোধ্য ও জঘন্য ধরনের ত্রিত্ববাদের জন্ম দিয়ে-ছিলেন যথাস্থানে সে কথা বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ করলে অবস্থাটা এ দাঁড়ায় যে —এক নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ সদাপ্রভুর আদেশ দু'নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ পবিত্রাত্মা (জিবরাইল বা হোলী ঘোস্ট) স্বর্গ হতে আগমন করেন এবং মেরী নাম্নী নারীর গর্ভে তিন নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ যীশু খৃস্টের জন্মদান করেন। বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশ ঃ এ মেরী হলেন, যোশেফ নামক জনৈক সূত্রধরের স্ত্রী, যোশেফের সাথে সহবাসের পূর্বে জানা যায় যে মেরী গর্ভবতী; তাঁর এই গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে—পবিত্রাত্মা বা জিবরাইলরূপী দু'নম্বর ঈশ্বরের দ্বারা।

সে যা হোক, যীশুর অন্তর্ধানের পরে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই যে তাঁকে 'ত্রাণকর্তা', 'অন্যতম ঈশ্বর' এবং 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' হিসেবে উপাস্যের আসনে বসানো হয়েছিল সে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ক্রমশ এ অবস্থার অবনতি ঘটে এবং গির্জাগৃহে যীশুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেই মূর্তির কাছে নতজানু হয়ে বন্দনা ও স্তবস্তুতি পঠিত হতে থাকে।

তথ্য-প্রমাণাদি থেকে জানা যায় ঃ হযরত মুহম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব-পূর্ব সময়ে এই অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল এবং ত্রাণকর্তা-রূপী যীশুর প্রতীক হিসেবে ক্রুশের কাঠ, যীশু অর্থাৎ অন্যতম ঈশ্বরের গর্ভধারিণী হিসেবে মেরী সরাসরি স্বর্গের ছাড়পত্র দাতা হিসেবে পল, পিটার্স প্রভৃতি পোপ-পাদ্রীগণ এবং পবিত্রাত্মার প্রতীক হিসেবে কবুতরের মূর্তিকে যীশু-মূর্তির পার্শ্বে প্রতি-ষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং মহা ধুমধামের সাথে পূজা-উপাসনার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

এ উপাসনাকালে উপরোক্ত মূর্তিসমূহের সম্মুখে নতজানু হয়ে যে বন্দনা-গীতি উচ্চারিত হয়ে থাকে নমুনাস্বরূপ তার কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

১. অল্প উন দু'হাজার
বর্ষ অগ্রে যে ঈশ্বর
বৈৎলেহেমের গো-শালাতে
করেন জন্ম ধারণ॥

ত্রিলোক ঈশ্বর যিনি
স্বর্গপুর ত্যাজি তিনি
নর প্রেমে হয়ে প্রেমী
নর স্বামী তিনি দীন বেশে

জগতের রাজা যিনি শুয়ে আছেন যাব পাল্লেতে ॥
অতি দীন ভাবে তিনি আইলেন পৃথিবীতে
করিতে পাপ মোচন ॥

২. ধন্য ধন্য ওগো মেরী হে ঈশ্ব-জননী
প্রভু সদা তব সহকারী ॥ পৃথিবীর রাণী
সর্বোপরিস্থ রাজার তুমি গো ঈশ জননী
তুমি আগমন দ্বার ॥ রমণীর শিরোমণি
তিনি ঈশ্বরের মাতা হন পূর্ণ কৃপা পরায়ণী
জানে তাহা সর্বজন ॥ ধন্য যীশু গর্ভ ফল তোমারি ॥[১]

জনৈক বাঙ্গালী পাদ্রী কর্তৃক রচিত এবং বাংলা ভাষাভাষী খৃস্টানগণ কর্তৃক পঠিত হলেও এ কবিতাটির মাধ্যমে যে মেরী এবং যীশু সম্পর্কীয় গোটা খৃস্ট জগতের মনোভাবকেই তুলে ধরা হয়েছে সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

কবিতাটিতে উল্লিখিত 'অল্প উন দু'হাজার বর্ষ' থেকেই এটা যে সাম্প্রতিক-কালে লিখিত সে কথা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। আর সাথে সাথে এ কথাও বুঝতে পারা যায় যে, বাইরের দিক দিয়ে খৃস্ট সমাজের কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও ভেতর অর্থাৎ অন্তরের দিক দিয়ে তাঁরা কোন অগ্রগতিই সাধন করতে সক্ষম হন নি। অর্থাৎ—অল্প উন দু'হাজার বর্ষ অগ্রে তাঁরা ধর্মীয় চিন্তাধারার দিক দিয়ে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন আজও ঠিক সেখানেই রয়ে গেছে।

১. অবিভক্ত বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রী আন্তনিও মারিয়েট কৃত 'ক্যাথলিক গীতাবলী' নামক পুস্তকের দশম গীত ও দূতের প্রার্থনা দ্রঃ (মুনসী মেহেরউল্লা প্রণীত 'রদ্দে-খৃস্টিয়ান' নামক পুস্তক থেকে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল—লেখক)।

আসুন! ভাল করে ভেবে দেখি

খৃস্টধর্মের অনুসারী ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ! উদ্বেগাকুল মন নিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়কে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল। এগুলো সম্পর্কে ভাল করে ভেবে দেখবেন এবং অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এটাই আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

সারা বিশ্বে ধর্মবিরোধী অভিযান চালু থাকা এবং দিনে দিনে উক্ত চক্রটি শক্তিশালী হয়ে কিভাবে গোটা পৃথিবীকে ধর্মহীনতার সীমাহীন অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে সে কথা অবশ্যই আপনাদের জানা রয়েছে। পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়াই যে তাদের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আশা করি সে কথাও আপনাদের অজানা নয়। অতএব অবিলম্বে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত না হলে গোটা পৃথিবীই যে ধর্মহীনতার সীমাহীন অতলে ডুবে যাবে আশা করি ঐ সহজ কথাটি আপনাদিগকে বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন হবে না।

আমরা যারা ধর্মকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি এবং ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদিগের মাধ্যমে এই প্রাণাধিক প্রিয় ধর্মকে টিকিয়ে রাখার আশা পোষণ করি, একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবো যে, আমাদের বংশধরেরা কিভাবে ক্রমবর্ধমান হারে সেই অশুভ চক্রের খপ্পরে পড়ে চরম ধর্মবিরোধী হয়ে গড়ে উঠছে।

আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেয়েছি যে, আমাদের স্নেহপ্রতীম বংশধরদিগকে ধর্মবিরোধী করে গড়ে তোলার কাজে সেই অশুভ চক্রটি ধর্মকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে।

প্রথমত, তারা ধর্মকে 'আফিং সদৃশ' শোষণের হাতিয়ার' 'বুর্জোয়াদিগের অস্ত্র' 'উদ্ভট ও অবান্তর কল্পনা', 'বর্বর যুগের চিন্তার ফসল' প্রভৃতি বলে

প্রচারণা চালিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে এবং পরে তাদের এসব কথার সমর্থনে ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন বাণী-বর্ণনাকে উদীয়মান তরুণ-তরুণীদিগের চোখের সম্মুখে তুলে ধরছে। ফলে এই চাক্ষুষ প্রমাণকে আমাদের সরলমতি ছেলে-মেয়েরা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস না করে পারছে না।

একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র কুরআন ব্যতীত সব-গুলি ধর্মগ্রন্থই নানা কারণে বিকৃত ও ভেজালে পরিপূর্ণ হয়েছে। প্রাচীনত্বের জন্যে সেগুলোর অনেক কথা যুগের অনুপযোগীও হয়ে পড়েছে। আশা করি, এসব বিষয় আপনাদের মতো বুদ্ধিমান, সুচতুর এবং অনুসন্ধিৎসু জাতির চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে নি।

আর ধর্মবিরোধী চক্রটি যে ওগুলোকেই তাদের মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছে সেকথা বলার প্রয়োজন হয় না। তবে আমি মনে করি যে, খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই জনসংখ্যা, ধনসম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা-গবেষণা প্রভৃতির দিক দিয়ে সর্বাধিক উন্নত এবং অগ্রসর। তাছাড়া নানা কারণে খৃস্টানদিগকেই তারা নিজেদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে।

এমতাবস্থায় খৃস্ট সমাজের মানুষদিগকে অধিক সংখ্যায় ধর্মবিরোধী করে গড়ে তোলাকে তারা যে নিজেদের কার্যোদ্ধারের সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বেছে নেবে, তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু থাকতে পারে না। আর এভাবে খৃস্ট সমাজকে ধরাশায়ী করতে পারলে অন্যান্যদিগকে ধরাশায়ী করা যে তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না, সে কথা খুলে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সমালোচনা অথবা নিন্দা প্রচারের সামান্যতম ইচ্ছাও যে আমার নেই, অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই যে আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি, শুরুতেই সেকথা বলা হয়েছে। যেহেতু আপনারাই উক্ত ধর্মবিরোধী চক্রটির প্রধান লক্ষ্য, অতএব আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থের যেসব গলদকে তারা মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছে অচিরাৎ সেগুলোকে দূর করা অথবা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা এবং কিভাবে ও কি কারণে পবিত্র ইঞ্জিলের মাঝে ওসবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অন্ততঃ নিজেদের বংশধরদিগের সম্মুখে সে কথা সবিস্তারে তুলে ধরা প্রয়োজন।

বিশেষ করে প্রোটেস্ট্যান্ট ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের নিকট আমার বিনীত আবেদন ঃ আপনাদেরই পূর্ব-পুরুষগণ ৩২৫ খৃস্টাব্দে নিকিও কাউন্সিল

(Council of Nicea) এবং ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্যান্টন বেরী অধিবেশনে গঠিত কমিটি কর্তৃক বাইবেলের ছ'ভাগের পাঁচ ভ'গকেই গলদ হিসেবে বাদ দেওয়ার মতো সৎসাহস দেখিয়েছিলেন ; আশা করি, যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনাদের মধ্যেও সেই সৎ সাহস রয়েছে। অতএব আজও তার মধ্যে যে সব গলদ রয়ে গেছে, বেছে বেছে সেগুলোকে বাদ দেওয়ার কাজে আপনারাও যে কোন ত্রুটি করবেন না দৃঢ়রূপেই সে বিশ্বাস আমি পোষণ করি। এ কাজে সহায়তাদানের জন্যে উক্ত গলদসমূহের কয়েকটিকে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যেখানে ছ'ভাগের পাঁচ ভাগকেই ইতিপূর্বে গলদ হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছে সেখানে পুনরায় গলদ বাছতে গেলে অবশিষ্টের কতটুকুই বা আর টিকে থাকবে?

এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ আমি মনে করি যে, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ যত অল্পই হোক সত্য-সাধকদিগের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে তাকে নিয়েই গর্বের সাথে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব। আর যদি গলদ হিসেবে সবটুকু বাদ দিতে হয় তাতেও পশ্চাদপদ না হওয়াকে আমি গৌরবজনক বলে মনে করি। কেননা, গলদের বোঝা বয়ে একদিকে আত্মসম্মান খোয়ানো অপেক্ষা শূন্যতা অনেক ভাল, অন্ততঃ মন্দের ভাল তো বটেই। অবশ্য এগুলো আমার অতি নগণ্য অভিমত। গ্রহণ করা বা না করা একান্তরূপেই আপনাদের অভিরুচির উপরে নির্ভর করছে। তবে গ্রহণ করুন আর না করুন অন্ততঃ ভালভাবে ভেবে দেখবেন এই আশা নিয়েই অতঃপর আজও বাইবেলে যেসব গলদ রয়েছে বলে আমি মনে করি, ভালভাবে ভেবে দেখা এবং ইতি-কর্তব্য নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে তার কতিপয়কে নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

o এ সম্পর্কে প্রথমেই বাইবেল বর্ণিত যীশুর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

বাইবেলে বলা হয়েছে যে "যীশু সদাপ্রভু বা ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র" (প্রেরিত ৮-৩৭) অবশ্য গোটা খৃস্টানজগতও সর্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাসই পোষণ করে থাকেন।

অথচ এটা একটি সর্ববাদীসম্মত সত্য যে—ঔরসজাত পুত্র' হওয়ার জন্যে যৌন সম্পর্ক একান্তরূপেই অপরিহার্য। অন্যদিকে, ঈশ্বর কর্তৃক কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে একমাত্র পাগল অথবা মতলববাজ

ছাড়া অন্য কোন মানুষই একথা বিশ্বাস করতে পারে না। অবশ্য বাইবেলও এরূপ কোন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা বলেনি।

বাইবেলে বলা হয়েছে—মেরীর স্বামী যোশেফ, সহবাসের সময়ে জানা গেল যে মেরী গর্ভবতী এবং এ গর্ভের সঞ্চার হয়েছে—পবিত্রাত্মা বা জিবরাঈল (গেব্রীয়েল) কর্তৃক।

—যোহন ১৮

ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূতেরা মানুষ নয়। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা মানুষের গর্ভ সঞ্চার সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও মেরী যে সদাপ্রভু বা ঈশ্বর কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছিলেন না এতদ্বারা সে কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এখন প্রশ্ন হল-ঈশ্বরের দ্বারা গর্ভবতী না হওয়া সত্ত্বেও কি উদ্দেশ্যে সেই গর্ভের সন্তানকে ঈশ্বরের ঔরসজাত বলা হয়ে থাকে?

আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। তথাপি আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্যে বলতে হচ্ছে ঃ

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের অবশ্যই একথা জানা রয়েছে যে, অবিবাহিতা অবস্থায় অলৌকিকভাবে মেরীর গর্ভসঞ্চার এবং সেই গর্ভে যীশুখৃস্টের জন্মলাভকে কেন্দ্র করে অতি নগণ্য সংখ্যক স্বজন-পরিজন ছাড়া গোটা ইহুদী সম্প্রদায়ই কিভাবে ক্ষিপ্ত এবং বেসামাল হয়ে উঠেছিল।

তারা যে মেরী এবং যীশুকে শুধু সমাজচ্যুত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেই ক্ষান্ত হয়েছিল না বরং যীশু জীবনের তেত্রিশটি বছর[১] ধরে এমনি ধরনের অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভণ্ড, জারজ, অভিশপ্ত, ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি বলে অভিযুক্ত ও ক্রুশ বিদ্ধ করতঃ অতি নির্মমভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি, আশা করি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের সে কথাও অজানা নয়।

সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় হল—এই হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পরেও ইহুদী সম্প্রদায়ের জিঘাংসার নিবৃত্তি হয়েছিল না—তারা তাদের এই হত্যাকাণ্ডকে যথার্থ ও যথাযোগ্য প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে যীশুকে ভণ্ড, জারজ, অভিশপ্ত প্রভৃতি বলে প্রচারণার কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল।

১. প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানা যায়, যীশুখৃস্ট ত্রিশ বছর বয়সে প্রত্যাদিষ্ট হন এবং মাত্র তেত্রিশ বছর বয়ক্রমকালে শত্রু কর্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

বলা বাহুল্য, 'যাঁর ইচ্ছা বা আদেশে সবকিছু হয়ে যায়' তাঁরই ইচ্ছা বা আদেশে মেরীর গর্ভ সঞ্চার হওয়াটা অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ছিল না।

অথচ যীশু সমর্থকগণ ইহুদী সম্প্রদায়ের উপরোক্ত প্রচারণার মুকাবিলা করতে গিয়ে এই সহজ-সরল কথাকে সার্থকভাবে তুলে ধরার পরিবর্তে 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' যীশুকে 'অন্যতম ঈশ্বর' 'ত্রাণকর্তা' প্রভৃতি বলে প্রতিপন্ন করার মত ভুল পদক্ষেপই গ্রহণ করেছিলেন—যা সত্য বলে প্রমাণ করার কোন সাধ্যই তাদের ছিল না। শুধু তা-ই নয়, এটা যে শুধু অন্যায়, অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্যই নয় বরং ঈশ্বরের পবিত্রতা, ইচ্ছাময়ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং সর্বশক্তিমানত্বেরও ঘোর পরিপন্থী সে কথাটা ভেবে দেখার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেছিলেন না। মোট কথা—

একদিকে ইহুদীদিগের এই জঘন্য প্রচারণার প্রত্যুত্তর দেওয়া এবং অন্যদিকে সাধারণ খৃস্ট ভক্তদিগের মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলা—এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের সহজ উপায় হিসেবে তদানীন্তন যীশু সমর্থকগণ যীশু সম্পর্কে এসব অলৌকিক ও অতিমানবিক কার্যকলাপের কল্পকাহিনী রচনা করে সেগুলোকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার জন্যে বাইবেলের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

শুধু ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্রই নয়—যীশুকে অন্যতম ঈশ্বরও বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাইবেল থেকে যীশুর উক্তি বলে কথিত কতিপয় বাক্যকে তুলে ধরা যেতে পারে। যথাঃ

"আমাতে পিতা আছেন এবং পিতা আমাতে আছেন।"

যোহন ১০/৩৮

"আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন—আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর।"

ঐ ১/১১

"আমি ও পিতা উভয়ই এক।"

—ঐ ১০/৬০

"যীশু ও ঈশ্বর এক এবং তিনি পূর্ণ ঈশ্বর।"

—জেমস্ ভন কৃত 'সফল ভবিষ্যদ্বাণী' ৩২৮ পৃঃ

পক্ষান্তরে এই বাক্যগুলির বিপরীত বাক্যও বাইবেলে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

"যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে তাহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।"
—লুক ৮/২১

"আমি আপন হইতে কিছু করিতে পারি না কেননা, আমি আপন ইষ্ট চেষ্টা না করিয়া আপন প্রেরণকর্তা পিতার ইষ্ট চেষ্টা করি।"
—যোহন ৫/৩০

"অদ্বিতীয় সত্য পরমেশ্বর তুমি আর (আমি) তোমার প্রেরিত মসীহ।"
—যোহন ১৭/৩

উল্লেখ্য যে, এমনি ধরনের বহু বাক্যই বাইবেলে রয়েছে, যদ্দ্বারা একথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন হয় না যে যীশু কোন দিনই ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নি। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে "তিন-এ এক এবং এক-এ তিন" এই অদ্ভুত থিওরী উদ্ভাবন ও যীশু কর্তৃক ঈশ্বরত্বের দাবী সম্পর্কীয় যেসব বাক্য উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেগুলি সবই পূর্বোক্ত নেতৃমণ্ডলীর রচিত।

প্রণিধানযোগ্য যে, বিশ্বপ্রভুর নিকট থেকে যীশুর নিকটে ইঞ্জিল নামক ধর্মগ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়েছিল। ধর্মগ্রন্থে থাকে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত বাক্য। একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র প্রভু কর্তৃকই ভৃত্যের প্রতি আদেশ-নিষেধাদি প্রদত্ত হয়ে থাকে। অতএব যীশু যদি ঈশ্বর হতেন তবে অন্য ঈশ্বর কর্তৃক তৎপ্রতি আদেশ প্রদত্ত হত না। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা ঈশ্বর ও যীশুর মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কই সূচিত হচ্ছে।

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! একটু ভাল করে ভেবে দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃতই যিনি ঈশ্বর তাঁর জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি থাকতে পারে না এবং অসীম অনন্ত হিসেবে সসীম কোন অবয়বও তাঁর থাকা সম্ভব নয়। অতএব যেহেতু যীশু জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতির অধীন ছিলেন এবং মানুষের মতো একটি দেহের অধিকারীও তিনি ছিলেন, অতএব তিনি কোনক্রমেই ঈশ্বর হতে পারেন না।

যীশুখৃস্টকে ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে। কারণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু খৃস্ট জগতের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন—অতএব তিনি 'ত্রাণকর্তা'।

তাঁদের এই কথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা মতে যীশুখৃস্টের জনৈক সহচর শত্রুপক্ষের নিকট থেকে ত্রিশটি টাকা ঘুষ খেয়ে তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং সে কারণেই তিনি যে অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতরূপে ধরা পড়েছিলেন এবং প্রায় সাথে সাথেই নিহত হয়েছিলেন—খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মনে সে সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও যে নেই এবং থাকা যে উচিত নয়, সে কথা নিশ্চিতরূপেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এমতাবস্থায় তিনি যে 'সকলের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রাণ দিলেন' এবং 'তাঁর এই পবিত্র রক্ত তথা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস' স্থাপন করা মাত্রই যে বিশ্বাসকারীদের জীবনের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ত্রাণ লাভ অবধারিত হয়ে উঠবে—এমন কথা বলে যাওয়ার কোন সুযোগ নিশ্চিত-রূপেই তিনি পান নি, পাওয়া সম্ভবই ছিল না। কেননা, তখন তিনি ছিলেন শত্রুর হাতে বন্দী।

অতএব এই ত্রাণকর্তা হওয়া সম্পর্কীয় যেসব কথা বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো কোন ক্রমেই যীশুখৃস্টের উক্তি হতে পারে না অর্থাৎ এই বাক্যগুলিও পূর্বকথিত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রচিত ও বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মধ্যে চিন্তাশীল ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ যথেষ্ট রয়েছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁরা একটু ভালভাবে ভেবে দেখবেন—এটাই তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

(ক) বিশ্বপ্রভু অর্থাৎ বিচারের নিরংকুশ কর্তৃত্ব যাঁর হাতে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ত্রাণকর্তা হওয়া সম্ভব কি না?

(খ) পাপানুষ্ঠানের ফলে মানুষের আত্মা দুর্বল বা কলুষিত হয়ে থাকে। অতএব ব্যক্তিগতভাবে অনুতাপ অনুশোচনা বা বিধিসঙ্গত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা আত্মার এই দুর্বলতা বা কলুষ-কালিমা বিদূরণ সম্ভব। এমতাবস্থায় একজন কর্তৃক অন্যজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোনরূপ ফলদায়ক হতে পারে কি না?

(গ) এমনি পাইকারীভাবে 'পাপ-মুক্তি' ঘোষণার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অবাধে এবং মনের সাধ মিটিয়ে পাপানুষ্ঠানের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে কি না এবং এই সুযোগ করে দেওয়ার ফলেই খৃস্টজগত এমনভাবে পাপের তাণ্ডবে মেতে উঠার সুযোগ ও প্রেরণা পেয়েছে কিনা।

(ঘ) একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধর্মীয় বাণী বাহকগণ শুধু বাণীই বহন করেন না; তাঁরা নিজদিগকে জাতির সম্মুখে আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিতও করেন। আর সেই আদর্শ থেকে প্রেরণা ও পথনির্দেশ লাভ করে জাতি আদর্শ হয়ে গড়ে উঠে। অথচ অতীতের মহাপুরুষদিগের জীবনীকে এমনভাবেই বিকৃত অতিরঞ্জিত করা হয়েছে যে, তাঁদের সত্যিকারের চরিত্র কি ছিল তা জানার কোন উপায় আজ আর নেই।

যীশুখৃস্টের বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। তাঁকে 'অন্যতম ঈশ্বর' 'ত্রাণকর্তা' 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' প্রভৃতিরূপে কল্পনা করে একেবারে উপাস্যের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে খৃস্টানদিগের পক্ষে তাঁর খৃস্ট চরিত্রের অনুকরণ-অনুসরণ করা, তথা আদর্শ মানুষরূপে গড়ে উঠার পথ চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

যীশুখৃস্টের অতিমানবীয় চরিত্রের কথা বাদ দিয়ে মানবীয় চরিত্রের যেটুকু পরিচয় বাইবেল থেকে পাওয়া যায়, তাও এমন-ই অদ্ভুত ধরনের যে, কোন মানুষের পক্ষেই তাঁর অনুকরণ- অনুসরণ সম্ভব হতে পারে না— তা করতে গেলে নির্মম ধ্বংসকেই অনিবার্য করে তোলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি জীবনে বিবাহ, ঘর-সংসার, অর্থোপার্জন প্রভৃতির কোনটাই করেন নি। এমন কি তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদিগকে এসব কাজে নিরুৎসাহিতও করেছেন। শুধু তাই নয়, বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়—তিনি নাকি একথাও বলেছেন, "সুচ-এর ছিদ্র দিয়ে গর্ভবতী উষ্ট্রীর গমনাগমন সম্ভব হলেও ধনী ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গে গমন সম্ভব নয়।"

এ সম্পর্কে বলার মতো বহু কথাই ছিল। কিন্তু স্থানাভাববশত তা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব মাত্র দুটি কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে।

(ঙ) পাদ্রী পুরোহিতদিগের অতি নগণ্য সংখ্যক ছাড়া যীশুখৃস্টের সমসাময়িক ভক্ত-অনুরক্তগণ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের খৃস্টানগণ যীশুখৃস্টের আদর্শকে নিদারুণভাবে অমান্য করে চলেছেন বা চলতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যথায় যীশুখৃস্টের তিরোধানের পরে পরেই এই ধর্মের নাম-নিশানা চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতো।

আমার এই কথার যথার্থতা যাঁচাই করার জন্য আমি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগকে শুধু একটি কথাই ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি যে, যীশুখৃস্টের সমসাময়িক ভক্ত-অনুরক্তগণ এবং তাঁর শিষ্যমন্ডলী যদি যীশুখৃস্টের এই আদর্শে জীবন গড়তে গিয়ে বিবাহ, সংসার ধর্ম পালন এবং অর্থোপার্জন থেকে বিরত থাকতেন তবে তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথেই চিরদিনের জন্য খৃস্টধর্মের অবসান ঘটতো এবং আজও যদি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ যীশুখৃস্টের আদর্শে জীবন গড়তে উদ্যোগী হন, তবে অবশ্যই তাঁদেরকে উল্লিখিত তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ফলে অন্যান্য বহু অসুবিধা ছাড়াও বংশবৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে খৃস্টধর্মেরও মৃত্যু ঘটবে। কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ধর্মের যিনি বাহক অর্থাৎ যাঁর মাধ্যমে ধর্মটির উদ্ভব ঘটলো তাঁর আদর্শকে বাদ দিয়ে যে ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে হয় সে ধর্মকে সত্যিকার অর্থে ধর্ম বলার কোন অবকাশই থাকে না।

একথা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা রয়েছে যে বিবাহ, অর্থোপার্জন এবং সংসার ধর্ম পালনের সাথে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। তাছাড়া, পেটের ক্ষুধা, যৌন ক্ষুধা এবং নিরাপদ ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়ের ক্ষুধা —সাধারণত এই তিনটি ক্ষুধাই মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে, আর এই সমস্যাত্রয়ের সমাধান করতে গিয়েই মানুষ ভুলবশত পাপ-দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার ও শোষণ-নির্যাতনের কাজে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় যে ধর্ম এমন তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন পথ-নির্দেশ তো দেয়-ই না বরং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার এবং স্বেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে সে ধর্ম মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি না সে কথাটিও ভাল করে ভেবে দেখার জন্য খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

চ) এ বিষয়টিও ভালভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি যে, মথি ২৭ অঃ ২৭-৫০ পদ, মার্ক ১৫ অঃ ১০-৩৮ পদ, লুক ২৩ অঃ এবং যোহন ১৯ অঃ (বাইবেল) থেকে জানা যায় যে, শত্রুহস্তে বন্দী হওয়ার পরে শত্রুগণ যীশুর পবিত্র গণ্ডে চপেটাঘাত করে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরায়, মুখে থু থু দেয় এবং পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে পানির বদলে সিরকা পান করায়। অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে। ক্রুশে বিদ্ধ করার প্রাককালে তিনি

'হে আমার প্রভো ! হে আমার প্রভো !! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে" বলে আর্তনাদ করেন।

এখন ভেবে দেখার বিষয় হল—যিনি এই অত্যাচার এবং অকাল মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে ত্রাণ করতে পারলেন না বরং ত্রাণ না করার জন্য নিজ প্রভুকে অভিযুক্ত করলেন, তিনি কি করে অন্যতম ঈশ্বর, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র এবং কোটি কোটি মানুষের ত্রাণকর্তা হতে পারেন ?

(ছ) বাইবেল, যিহিস্কেল ১১ অঃ ৩১ পদ, ১৮ অঃ ২০ পদ এবং ২২ অঃ ৩১ পদে যথাক্রমে লিখিত রয়েছে 'যে প্রাণী পাপ করে সে-ই মরিবে' 'পুত্র পিতার অপরাধ ভোগ করিবে না ও পিতা পুত্রের অপরাধ ভোগ করিবে না', 'ধার্মিক আপন ধর্মের ফল ভোগ করিবে ও দুস্ট আপন দুস্টতার ফল ভোগ করিবে।'

এখন ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি মানুষকে যদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ পাপের ফল বা প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তবাদ (Doctrine of Atonement) বা "যীশু নিজেই খৃস্ট জগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন; সুতরাং খৃস্টানগণ যত পাপই করুন না কেন, সে জন্যে তাঁদিগকে আর কোনরূপ শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে না"—বাইবেলের এই উক্তি স্ববিরোধী, অযৌক্তিক এবং বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য কি না, আর এতদ্বারা ধর্মবিরোধী চক্রটি ধর্মকে 'মিথ্যা', 'বর্বর যুগীয়', 'আফিম সদৃশ্য' প্রভৃতি বলার সুযোগ পেয়েছে কি না ?

(জ) অতঃপর ভাল করে ভেবে দেখার জন্যে ইতিহাসের পাতা থেকে কয়েকটি ঘটনা আমার খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের সম্মুখে তুলে ধরছি ঃ

o ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় (অর্থাৎ ইসলাম যখন পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি) দেশবাসী কর্তৃক নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত নও-মুসলিমদিগের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ, শত্রুপক্ষ কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে তথাকার খৃস্ট ধর্মাবলম্বী সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ, অভিযোগ উত্থাপন, নাজ্জাশী কর্তৃক নও-মুসলিমদিগকে আহবান, বক্তব্য শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন এবং এই খৃস্টান সম্রাটের ইসলাম গ্রহণের কারণটি ভাল করে ভেবে দেখুন।

o ভেবে দেখুন—সেই থেকে মুসলমানদিগের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তো বটেই শুধু খৃস্টধর্মেরই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ছাড়াও কত সম্রাট, কত রাজা, কত প্রথিতযশা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে এবং শুধুমাত্র অনাবিল ধর্মীয় আকর্ষণে ইস-লাম গ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন।

o তারপরে ভেবে দেখুন—একমাত্র ইসলামের সত্যতা ছাড়া এদের ইসলাম গ্রহণের অন্য কোন কারণ আছে কি না এবং থাকতে পারে কি না।

o অবশেষে ভেবে দেখুন—সুদীর্ঘকাল যাবত গোটা খৃস্টজগতের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, অপরিমেয় অর্থব্যয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রচারকের অক্লান্ত সাধনায় আজ পর্যন্ত অজ্ঞ-অশিক্ষিত, দীন-দরিদ্র এবং সমাজের নিম্নস্তরের অতি নগণ্য সংখ্যক ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী কোন সম্রাট, কোন রাজা বা উল্লিখিত ধরনের প্রথিতযশা কোন একজন মানুষও শুধু ধর্মীয় প্রেরণায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন কিনা; যদি না করে থাকেন তবে তার কারণ কি ?

অতঃপর অতীব লজ্জা এবং দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বাইবেলে স্ববিরোধী, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত বাণী বর্ণনার তো কোন অভাব নেই-ই, উপরন্তু এমন বহু অশ্লীল এবং অশালীন ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো উচ্চারণ করতেও জিহবা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

শালীনতাবোধের স্বাভাবিক তাকীদেই ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু ধর্মের ভবিষ্যৎ এবং ধর্মবিরোধী চক্রটির অনিষ্টকারিতার কথা চিন্তা করে তা আর সম্ভব হয়ে উঠল না; অগত্যা যতদূর সম্ভব শালী-নতা বজায় রেখে ওধরনের কয়েকটি মাত্র ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হল ঃ

(ক) বিখ্যাত ধর্মীয় মহাপুরুষ নোয়া (হযরত নূহ্ আঃ) সম্পর্কে আদি-পুস্তক ৯ অঃ ২-২৩ পদে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হল ঃ তিনি প্রায়ই মাতাল অবস্থায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতেন আর সে সময়ে তাঁর পুত্রগণ তথায় গমনাগমন করতেন এবং পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতেন।

(খ) সুবিখ্যাত বার্তাবাহক মহাপুরুষ ডেভিড (হযরত দাউদ আঃ) সম্পর্কে বাইবেল ২য় শিমুয়েল ১১ অঃ ২-১৭ পদে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম হল—তিনি (ডেভিড) বৎসেবা নাম্নী জনৈক পরমা সুন্দরী রমণীকে স্নানরতা

অবস্থায় দর্শন করে ভীষণ ভাবে কামাসক্ত হন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উক্ত রমণীর স্বামীকে কোন যুদ্ধে পাঠান এবং হত্যা করান। পরিশেষে উক্ত রমণীকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। অথচ এই ডেভিড-এর নিকটেই না কি যাবুর নামক পবিত্র গ্রন্থখানা অবতীর্ণ হয়েছিল!

(গ) লোট (হযরত লুৎ আঃ) সম্পর্কে বাইবেল, আদিপুস্তক ১৯ অঃ ৩০-৩৮ পদে যে ঘটনা বর্ণিত রয়েছে তা কলমের সাহায্যে প্রকাশ করা তো দূরের কথা চিন্তা করতেও মন দুঃখ ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ে। ইঙ্গিতে শুধু এটুকু বলা যাচ্ছে যে, তিনি নিজেই নাকি তাঁর দুটি কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং তার ফলে উভয়েরই একটি করে সন্তানের জন্ম হয়।

উক্ত সন্তানদ্বয়ের নাম যথাক্রমে মোয়াব এবং বিনম্মি। এরাই নাকি মোয়াবী ও আম্মোনীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের আদি পিতা।

(ঘ) শলোমন (হযরত সুলাইমান আঃ)-এর মত মহাপুরুষ সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তিনি পর-স্ত্রীর সাথে প্রেম করতেন, তা ছাড়াও তাঁর নাকি তিনশত উপপত্নীও ছিল!

—বাইবেল রাজাবলী ১ম অঃ ১—৩ পদ

এখানেই এসব জঘন্য ঘটনার ইতি টানছি। তবে সাথে সাথে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগকে তাঁদের স্মৃতিতে এ কথাটি বিশেষ ভাবে জাগরূক রাখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি যে, আমরা অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্ম-গ্রন্থের এসব স্ববিরোধিতা, সামঞ্জস্যহীনতা এবং অশ্লীলতা প্রভৃতিকে 'লীলা' 'সুসমাচার' বা অন্য কিছু আখ্যা দিয়ে ভক্তিতে গদগদ হতে পারি। ওগুলো পাঠ ও শ্রবণের মধ্যে পরিত্রাণ লাভের সুযোগ আবিষ্কার করতে পারি, অমৃতের স্বাদও অনুভব করতে পারি। এমন কি এই স্বাদ অনুভব করার মাধ্যমে অমরত্ব লাভের পুলকও উপভোগ করতে পারি।

কিন্তু উপরোক্ত ধর্মবিরোধী চক্রটি এই সব 'অমৃত সমান' 'লীলা কাহিনী' থেকেই তীব্র বিষ আহরণ করে ধর্ম এবং তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস এ উভয়েরই ভবলীলা সাঙ্গ করার কাজ বেশ দক্ষতা এবং সাফল্যের সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের উভয় পক্ষের কাজই যদি এমনি ভাবে চলতে থাকে তবে সেদিন খুব বেশী দূরে নয়—যেদিন এসব তথাকথিত ধর্ম এবং আমাদের মতো ধার্মিকদের নাম-নিশানাও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না।

অতঃপর আমার ওয়াদা অনুযায়ী—'ইঞ্জিল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দটি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দু'কথা বলতে হচ্ছে। তবে পুস্তকের কলেবর অপ্রত্যাশিতরূপে বেড়ে চলায় এ সম্পর্কে যেসব কথা বলার এবং যেসব তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল তা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে ওসব তথ্য-প্রমাণ সহকারে পৃথক একখানা পুস্তক লেখার আশা বুকে নিয়ে আপাতত অতি সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দিয়েই বিদায় নিতে হচ্ছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে 'কেন এ ছলনা?' এই উপ-শিরোনাম দিয়ে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হল।

কেন এ ছলনা

একথা অনস্বীকার্য যে 'সুসংবাদ' এবং 'সুসমাচার'—এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান তাৎপর্যগত পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়ে না।

কিন্তু 'ইঞ্জিল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ চয়নের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করে-ছিলেন নিশ্চিত রূপেই তাঁরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। সুতরাং এই পার্থক্য যত সূক্ষ্মই হোক তাঁদের চোখে সেটা ধরা না পড়ার সঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না।

ইতিপূর্বে তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে একথাও বলা হয়েছে যে—যেহেতু ইঞ্জিলের মধ্যে বহু সংখ্যক 'কু' বা 'দুঃখজনক' সমাচার রয়েছে অতএব তার নাম সুসমাচার রাখা শুধু অন্যায় এবং অসঙ্গতই নয়—রীতিমত বিভ্রান্তিকরও।

বিভিন্ন দিক চিন্তা করে এ সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত যে, জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবেই সুসংবাদ-এর পরিবর্তে 'সুসমাচার' শব্দ-টিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

আমার এই সুনিশ্চিত হওয়ার কাজে ইঞ্জিল অবতরণের পটভূমিকা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। অতএব এ সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্যে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণের উদ্দেশ্যে উক্ত পটভূমিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়কে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

০ মাতার সতীত্বহীনতা এবং নিজের জারজত্বে মিথ্যা কলঙ্ক, লাঞ্ছনা, অপমান, প্রাণ নাশের হুমকি প্রভৃতির মধ্যে কি নিদারুণ অবস্থায় যীশু-জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে, সে আভাস ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি।

০ বাইবেলের বর্ণনা সত্য হলে যীশুখৃস্টকে যে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়ক্রমকালে শত্রু হস্তে অতি নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছিল, সে কথাও স্বীকার করে নিতে হয়।

০ অথচ মেরী এবং যীশু এই অবস্থার জন্যে মোটেই দায়ী ছিলেন না। কেননা, 'যাঁর ইচ্ছা বা আদেশমাত্র সব কিছুই হয়ে যায়' তাঁরই ইচ্ছা বা আদেশে মেরীর গর্ভ সঞ্চার এবং সেই গর্ভে যীশুর জন্ম হয়েছিল।

০ অতএব, এ থেকে অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিশ্বপ্রভু অর্থাৎ যাঁর ইচ্ছা বা আদেশে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল শুধু সর্বজ্ঞ হিসেবেই নয়, ঘটনার সংঘটক হিসেবেও একমাত্র তিনিই মেরী এবং যীশুর নির্দোষিতা সম্পর্কে সম্যক ও সুনিশ্চিতরূপে অবহিত ছিলেন এবং এই নির্দোষিতা প্রমাণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনও একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

০ অথচ কাজটি ছিল একান্তরূপেই জটিল ও স্পর্শকাতর। কেননা, এক দিকে বিশ্বপ্রভুর পক্ষে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে এই নির্দোষিতা প্রমাণ করা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনই এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অভিযুক্তের কোন কথা, কোন যুক্তিই অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না বলে মেরী বা যীশুর প্রমুখাৎ কোন কথা বা কোন যুক্তি উত্থাপন করে প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন এবং নির্দোষিতা প্রমাণ করাও ছিল একান্তরূপেই অসম্ভব।

০ আশা করি, এ থেকেই অবস্থায় জটিলতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তবে অবস্থা যত জটিলই হোক—যেহেতু বিশ্বপ্রভুর ইচ্ছা বা আদেশের ফলকে এমন অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষী দুটি প্রাণীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অতএব এই নির্দোষিতা প্রমাণ করে উভয়কে কলঙ্কমুক্ত করা ছিল বিশ্বপ্রভুর একটি নৈতিক দায়িত্ব।

০ এদিকে এই জটিল পরিস্থিতি আর অন্যদিকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং লাঞ্ছনা-নির্যাতনই নয়, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের কোটি কোটি

মানুষের কাছে চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকার আশংকায় মেরী এবং যীশু যে কত বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, সে কথা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

০ আর এই কারণে তাঁরা উভয়েই যে অন্তরের সকল নিষ্ঠা, সকল একাগ্রতা এবং সকল ঐকান্তিকতা নিয়ে এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্যে বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুহূর্ত প্রার্থনা করে চলেছিল এবং তাঁদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর হল কি না, আর হয়ে থাকলে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বা হতে চলেছে—এই একটি মাত্র সংবাদ জানার জন্যে সর্বতোভাবে উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষারত ছিলেন সে কথাও সহজেই অনুমেয়।

০ অথচ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বপ্রভুর পক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অথবা অভিযুক্তদ্বয়ের মাধ্যমে কোন কথা বা কোন যুক্তির অবতারণা করে এই কলঙ্ক অপনোদন সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় এই কাজের জন্যে একটি মাত্র পথই খোলা ছিল, আর তা হল—বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে এমন একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি আবির্ভূত হওয়া, যাঁর সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে এবং প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডনেও তিনি যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হন।

০ উল্লেখ্য যে, বিশ্বপতি কর্তৃক তেমনই এক মহাপুরুষের আবির্ভাব মঞ্জুরীকৃত হয়েছিল। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, যীশু-জীবনের ত্রিশটি বছরের সুদীর্ঘ ও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পরে প্রত্যাদিস্ট মহাপুরুষ হিসেবে যীশুর কাছে যে ধর্মীয় গ্রন্থখানা অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিল, তাতে সাধারণভাবে ধর্ম সংক্রান্ত যত কথা এবং যত সমাচারই থাকে এই মঞ্জুরীকৃত হওয়ার সংবাদটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদরূপে ওতে স্থান পাওয়া যে খুবই স্বাভাবিক ছিল, সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। আর পারে না বলেই একদিকে গুরুত্বের স্বীকৃতি এবং অন্যদিকে উক্ত সুসংবাদটি যে এই গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে সে কথাকে সুস্পষ্ট ও ভাস্বর করে তোলার জন্যই গ্রন্থখানার নাম রাখা হয়েছিল—'ইঞ্জিল' অর্থাৎ 'সুসংবাদ'।

০ শুধু মেরী এবং যীশুখৃস্টই নন; অতীতের প্রত্যাদিস্ট মহাপুরুষদের প্রায় সকলের চরিত্রেই যে নানা ভাবে নানা কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছিল ইতিপূর্বে তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে সে কথা তুলে ধরা হয়েছে। স্বার্থসংশ্লিস্ট মহল এবং অজ্ঞ ও অতি ভক্তেরা যাই করুন আর যাই ভাবুন, তখনও যাঁদের মধ্যে কিছুটা ধর্মভাব জাগ্রত ছিল তাঁরা যে এই জঘন্য ঘটনার জন্যে অপরিসীম

লজ্জা ও অসহনীয় বেদনা অনুভব করে চলেছিলেন এবং প্রতিকার-প্রতিবিধানের জন্যে বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্যে কাতরভাবে প্রার্থনা করে চলেছিলেন সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

বিশ্বপতির পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বা হতে চলেছে—স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা যে সে সুসংবাদটি জানার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে চলেছিলেন, সে কথাও অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে এহেন জঘন্য কলঙ্ক অপনোদনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হল পরবর্তী ঐশী গ্রন্থ হিসেবে এই গ্রন্থখানার মাধ্যমে, সে সুসংবাদটি ঘোষিত হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। আর হয়েছিলও তাই। এ দিক দিয়ে বিচার করলেও গ্রন্থখানার নাম ইঞ্জিল অর্থাৎ সুসংবাদ হওয়াই ছিল সঙ্গত এবং প্রত্যাশিত।

o ইতিপূর্বে যেসব ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই এই সুসংবাদটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়ে এসেছে যে—'শেষ যুগে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে আর তিনি হবেন পাপ বিনাশী এবং ধর্মের পূর্ণতা বিধানকারী।'[১]

উল্লেখ্য যে, এখানাই ছিল সেই সংবাদটি ঘোষণার সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ এবং এর মাধ্যমে তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ঘোষণাও করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এদিক দিয়ে চিন্তা করলেও এই গ্রন্থখানার নাম ইঞ্জিল অর্থাৎ সুসংবাদ হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল বলে বুঝতে পারা যায়।

o পাপ-দুর্নীতি ও শোষণ-জুলুমের মাত্রা সকল সীমা অতিক্রম করে চলায় প্রতিটি ধর্মের মানুষই সেই পাপ বিনাশী মহাপুরুষের আগমন কবে ঘটবে এই একটি মাত্র সুসংবাদের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল; আর তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই গ্রন্থখানার মাধ্যমেই। সুতরাং ইঞ্জিলই যে এই গ্রন্থখানার যথাযোগ্য নাম এবং 'সুসংবাদ'ই যে ইঞ্জিলের যথাযোগ্য প্রতিশব্দ সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকছে না।

'ইঞ্জিল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যে 'সুসমাচার' নয় বরং 'সুসংবাদ' আশা করি, এই কয়েকটি মাত্র উদাহরণ থেকেই সে কথা বুঝতে পারা যাবে।

১. Muhammad in world Soriptures এবং ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের 'বেদে ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ' দ্র.।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে অতঃপর উক্ত 'সুসংবাদটি'কে বাইবেল থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shal he speak : and he will show you things to come. He shall glorify me. John 16 : 12-14

অর্থাৎ—তোমাদের কাছে এখনও আমার বহু কথাই বলিবার রহিয়াছে। কিন্তু এখন সেগুলিকে তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না। যাহা হউক, যখন সেই সত্যের আত্মা আবির্ভূত হইবেন, তিনি তোমাদিগকে সত্যের পথে পরিচালিত করিবেন। কেননা, তিনি নিজ হইতে কোন কথা বলিবেন না—(বিশ্বপ্রভুর নিকট হইতে) যাহা তিনি শ্রুত হইবেন তাহাই তিনি বলিবেন। ঘটিতব্য বিষয়সমূহও তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিবেন। (এবং) তিনি আমাকে কলঙ্কমুক্ত করিবেন।

—যোহন ১৬ অঃ ১২—১৪ পদ

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আসল ইঞ্জিলে এই সুসংবাদটি কিভাবে লিখিত ছিল এবং তাতে কি কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল, সে কথা জানার কোন উপায়ই আজ আর নাই।

বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদের কোন কোনটিতে এই আগন্তুক মহাপুরুষকে 'Paraclet' এবং কোন কোনটিতে Comforter বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেল নতুন নিয়মে Periklutos শব্দটি বিদ্যমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুবাদক কর্তৃক যার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে Parakeldtos বানানো হয়েছে। এর বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে কেউবা 'সহায়' আবার কেউবা 'শান্তিদাতা' শব্দকে প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে বাইবেল নতুন নিয়মের আরও কতিপয় স্থানে এই সুসংবাদটি কিছুটা ভিন্ন ভাবে পুনরুক্ত হয়েছে।

তওরাত এবং আল্লোপনিষদে 'মুহম্মদ' শব্দটি আজও অবিকল ভাবে বিদ্যমান রয়েছে—যদিও ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারদের অনেকে নিজেদের ইচ্ছামত তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। হিব্রু তওরাতে মুহাম্মদ এর পরিবর্তে 'মুহাম্মদীম' লিখিত থাকবে দেখা যায়। অবশ্য ব্যাকরণ অনুযায়ী

মুহম্মদীম-এর তাৎপর্য যে 'সম্মানিত মুহাম্মদ' (সাঃ), বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকেই বিশ্লেষণ দ্বারা সে কথা প্রমাণ করেছেন।

বাইবেলের কোন কোন টীকাকার সুস্পষ্টভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন যে 'মুহম্মদ'-এর আবির্ভাবে যীশুখৃস্টের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

প্রাথমিক যুগে বাইবেলের আরবী অনুবাদে 'আহমদ' শব্দটি বিদ্যমান থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে পাদ্রী সেল সাহেবের সাহায্যে এই শব্দটিকে যে খৃস্টানদের অনুকূলে বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে। Mr. William Muir তাঁর প্রণীত Life of Mohammed নামক পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে সেকথা স্বীকার করেছেন।[১]

'কল্ক অর্থ পাপ।' আর 'কল্কী' অর্থ 'পাপ বিনাশী'। কলিযুগের শেষ পৃথিবী যখন পাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তখন সেই পাপ বিনাশের জন্যে কল্কী (পাপ বিনাশী)-র আবির্ভাব ঘটবে বলে কল্কীপুরাণে লিখিত রয়েছে। কলির শেষে আগমনকারী এবং পাপ বিনাশী এই ব্যক্তি যে হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যতীত আর কেউ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' এইরূপ নাম বিশিষ্ট বৃষ ভক্ষণকারী জনৈক দেবতার আবির্ভাব সম্পর্কে সামবেদে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। এইরূপ নাম বিশিষ্ট এবং বৃষ ভক্ষণকারী দেবতা যে কে, সে কথা খুলে বলার কোন প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

মহাভারতে বলা হয়েছে—'চারিখানা বেদের পরস্পরের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রগুলির অবস্থাও তদ্রূপ, মুণি-ঋষিদের পরস্পরের মতও অভিন্ন নয়' উক্ত শ্লোকের পরবর্তী পংক্তিটি হল: 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহীতং গুহায়াং' অর্থাৎ—ধর্মের তত্ত্ব পর্বত গুহায় নিহিত রয়েছে। এখানে প্রশ্ন হল—সেটি কোন পর্বতের গুহা এবং কে সেই মহাপুরুষ যিনি পর্বতগুহায় সিদ্ধিলাভ করে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই রয়েছে। আর তা হল—সেই পর্বতের নাম 'জবলে নুর'; গুহার নাম 'হেরা' এবং মহাপুরুষটির নাম—'হযরত মুহাম্মদ (স.)।'

১. ১ অঃ ৫ম পৃঃ (১৯২৩) দ্রষ্টব্য।

উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে অতঃপর শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে মনে করি যে, পৃথিবীর বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটিতে কোন-না-কোন ভাবে এই মহাপুরুষের আগমন সংক্রান্ত সংবাদটি আদিম জামানা থেকে ঘোষিত হয়ে এসেছে। আর যীশুখৃস্টের কাছে অবতীর্ণ গ্রন্থখানাই ছিল এই সংবাদটি ঘোষণার শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সুতরাং তার নামকরণও তদনুযায়ী হওয়াই ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে বিচার করলেও 'ইঞ্জিল' শব্দের অর্থ যে সুসমাচার নয় বরং 'সুসংবাদ' সেকথা না বলে উপায় থাকে না।

তাছাড়া—ধর্মগ্রন্থে সাধারণত থাকে 'তত্ত্বকথা' এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদি কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে সে সব 'সমাচার।' আর কারো আগমন সংক্রান্ত বাক্যকে সকল দেশেই বার্তা বা 'সংবাদ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এবং উক্ত আগন্তুক সমাগত হয়ে যে সব কার্য সম্পাদন করেন সে সবের বর্ণনা বিবরণকেই সাধারণত সমাচার বলে অভিহিত করার রীতি প্রচলিত রয়েছে।

পরিশেষে প্রসঙ্গের উপসংহার হিসেবে বলা যাচ্ছে যে, ইঞ্জিলে বিভিন্ন তত্ত্বকথা এবং ধর্মীয় সমাচার তো রয়েছেই—তদুপরি এই সুসংবাদটিও রয়েছে। এই থাকায় কথা এবং সুসংবাদটির গুরুত্বকে সার্থকভাবে তুলে ধরার জন্যেই এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইঞ্জিল' বা 'সুসংবাদ'।

যে প্রশ্নটির উত্তর না দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, অতঃপর সেটিকে তুলে ধরতে হচ্ছে। প্রশ্নটি হল—ইঞ্জিলের বাংলা প্রতিশব্দ চয়নকারী পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে 'সুসংবাদ' এবং 'সুসমাচারের' মধ্যে বিদ্যমান এসব পার্থক্যের কথা জানতেন না কোনক্রমেই সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হল; জেনে শুনেও তাঁরা সুসংবাদের পরিবর্তে সুসমাচারকে কেন গ্রহণ করেছিলেন?

এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হল—জনগণ বিশেষ করে খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিদিগের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি কর উল্লিখিত সুসংবাদটি থেকে তাঁদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে তাঁরা এ কাজ করেছিলেন।

কারণ, বাংলা বাইবেলের নাম সুসংবাদ রাখা হলে মানুষ স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু হয়ে গোটা গ্রন্থখানার মধ্যে 'সুসংবাদ' কোনটি বা কোনটি

সুসংবাদ হওয়ার যোগ্য তা খুঁজে বের করবে এবং হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে—এমন একটা ধারণা তাঁরা করে নিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে 'সুসমাচার' রাখা হলে গোটা গ্রন্থের যাবতীয় বাণী-বর্ণনা গুলোকেই যে সুসমাচার বলে চালিয়ে দেওয়া ছাড়াও সুসংবাদটির গুরুত্বকে লাঘব করা এমনকি তার অস্তিত্বকেই যে গোপন করে ফেলা সহজ ও সম্ভব হবে এমন একটা ধারণাও উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মন-মগজে দানা বেঁধে উঠে-ছিল। আর এটা-ই ছিল সুসংবাদের পরিবর্তে 'সুসমাচার' শব্দটিকে গ্রহণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁদের এই বিদ্বেষের কারণ কি? আর কেনই বা তাঁরা ইঞ্জিল ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত এই সুসংবাদটিকে সরল ভাবে গ্রহণ করেন নি?

এই প্রশ্নের উত্তর হল প্রতিটি ধর্মের মানুষই এ ধারণা পোষণ করে চলেছিলেন যে—"আজও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষটির আবির্ভাব ঘটেনি এবং নিশ্চিতরূপে তিনি আমাদের মাঝেই আবির্ভূত হবেন।

কিন্তু যখন দেখা গেল যে তিনি তাদের কারো মধ্যে আবির্ভূত না হয়ে মক্কার কোরাইশ বংশে আবির্ভূত হলেন তখন সকলেই ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত ও হতাশ হয়ে তাঁর বিরোধিতায় মেতে উঠেন।

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে—যেহেতু বাইবেল সহ সবগুলি ধর্মগ্রন্থেরই ছাটখাট রদ-বদল করা হয়েছে, এমতাবস্থায় উক্ত সুসংবাদটিকেও তো তারা অনায়াসে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে বাদ দিতে পারতেন; ফলে সব ল্যাঠাই চুকে যেতো।

তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর হলো: নানাভাবে উক্ত নামটির কদর্থ করার চেষ্টা যে করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে ইতিপূর্বে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি এবং আজও পেয়ে চলেছি। গোটা সুসংবাদটিকে বাদ না দেওয়ার কারণ হলো: এতদ্বারা তাঁরা একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) তো প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ নন-ই এমন কি তিনি মহাপুরুষই নন। আসলে এখনো প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবই ঘটেনি এবং যখন ঘটবে তখন নিশ্চিতরূপে তা ঘটবে আমাদেরই মাঝে।

ভবিষ্যদ্বাণীটি কিভাবে সফল হল

এবারে আর একটি কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি। কথাটি হলো: ইতিপূর্বে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত বাণীটিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হযরত মুহম্মদ (স.) মেরী এবং যীশুকে কলঙ্কমুক্ত করবেন বলে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন জানা প্রয়োজন যে বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে কিনা। আর হয়ে থাকলে কিভাবে তা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পাঠকমাত্রই অবহিত রয়েছেন যে, শুধু মেরী এবং যীশু-ই নন—বিশ্বের প্রত্যাদিষ্ট সকল মহাপুরুষকেই সৎ, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ বলে পবিত্র কুরআন পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়—তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস পোষণ এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে প্রতিটি মুসলমানের জন্যে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ বলেও বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ কাজ করা না হলে কেউ মুসলমান বলে গণ্যই হতে পারে না।[১]

পবিত্র কুরআনের পাঠক মাত্রেই একথাও জানা রয়েছে যে, মেরীর সতী-সাধ্বী এবং বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারিণী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানেই নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করা ছাড়াও 'সূরা মরিয়ম' নামে সম্পূর্ণ একটি সূরাকে পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশ করত তাঁকে বিশেষ-ভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। তা ছাড়া পবিত্র কুরআনের দু'চারটি পৃষ্ঠার পরে পরেই মেরী এবং যীশুখৃস্টের প্রশংসাসূচক বাণীরও উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

শুধু একথা বলেই বলা শেষ হয়ে যায় না। এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, প্রতিটি ধর্মেরই এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে মুখের ভাষায়, পুঁথি-পুস্তকের মাধ্যমে এমনকি দৈহিকভাবে আক্রমণ করতেও কোন ত্রুটি করেনি। অথচ এমনভাবে আক্রান্ত এবং নাজেহাল হওয়ার পরেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আক্রমণকারীদের মধ্যে আবির্ভূত মহাপুষরুষদিগের

১. বেদ অনুযায়ী তিনি নরাশংস, ভবিষ্য পুরাণের মতে তিনি অন্তিম ঋষি বা অন্তিম, অবতার। কল্কিপুরাণানুযায়ী তাঁর নাম কল্কি অবতার বা পাপ বিনাশী; বাইবেল অনুযায়ী তিনি কম্‌ফোর্টার বা শান্তিদাতা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তিনি মৈত্রেয়। ডঃ বেদ প্রকাশ উপধ্যায় এম, এ (রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক প্রণীত 'বেদ-পুরাণে হযরত মুহম্মাদ' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

প্রশংসা করেছেন—নানাভাবে তাঁদের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন; তাঁদের সম্মান হানি হতে পারে সারা জীবনে এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি।

বরং বিশ্ববাসীর কাছে তিনি নানাভাবে একথাই তুলে ধরেছেন যে, 'বিশ্বের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষেরা কেউ পরস্পর থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নন। কেননা আবহমানকাল ধরে তাঁরা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে অথবা একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইসলামের মহান শিক্ষারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।'

"অতএব সকলেই আল্লাহ্‌র মনোনীত মহাপুরুষ এবং ইসলামের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা। আর নানা কারণে সেই ইসলামের মধ্যে যে সব আবিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে—আমাকে পাঠানো হয়েছে ইসলামকে সেই সব আবিলতা থেকে মুক্ত, প্রাণবন্ত ও পরিপূর্ণ করে তুলতে।"

এ সম্পর্কে তাঁর পবিত্র মুখ-নিসৃত একটি বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে বাণীটি হল : "একটি অতি মূল্যবান হার গাঁথার কাজ চলছিল। একটি মাত্র দানার জন্যে হারটি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। সেই দানাটি-ই আমি আমার সংযোজন দ্বারা হার গাঁথার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।"

বলা বাহুল্য, এতদ্বারা তিনি বিশ্বের সকল প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে শুধু একই সূত্রে গ্রথিত করেন নি—সকলকে সমমর্যাদার অধিকারী, পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্পন্ন প্রত্যেকের বিদ্যমানতাকে অপরিহার্য বলেও ঘোষণা করেছেন।

এ কারণেই এক মহাপুরুষের অনুসারী কর্তৃক অন্য মহাপুরুষকে ভিন্ন ও হেয় মনে করা এবং নিন্দা প্রচারকে তিনি ধর্ম ও নীতি-বহির্ভূত অতি জঘন্য কাজ বলে ঘোষণা করে প্রতিটি মুসলমানকে সর্বপ্রযত্নে তা থেকে বিরত থাকার জন্যে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এমন জঘন্য কাজের অনুষ্ঠাতা যে মুসলমান পদবাচ্য হতে পারে না—দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথাও ঘোষণা করেছেন।

তাঁর অনুসারিগণ যে অতীব নিষ্ঠার সাথে এই নির্দেশকে মেনে চলছে এবং চিরদিনই চলতে থাকবে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হলো—বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বনবী (সা) ও ইসলামের প্রতি যেসব অত্যাচার-অবিচার করেছে এবং করে চলেছে একথা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে জানা থাকার পরেও

বিশ্বের অন্তত ১০০ কোটি মুসলমান মেরী, যীশুখৃস্ট এবং অন্যান্য যেসব মহাপুরুষের চরিত্রে জঘন্য কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে, তাঁদেরকে সহ বিশ্বের সত্যদ্রষ্টা সকল মহাপুরুষকে শুধু অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেই চলছে না, বরং নিজেদের মুখের কথা, আলাপ-আলোচনা, বই-পুস্তক, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তাদের সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং মহাপুরুষত্বের কথা বিশ্বব্যাপী প্রচার করাকে অন্যতম কর্তব্য হিসেবে পালন করে চলেছে।

বাইবেলের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি অর্থাৎ সাধারণভাবে বিশ্বের প্রত্যাদিষ্ট সকল মহাপুরুষ এবং বিশেষভাবে মেরী ও যীশুখৃস্টকে কলঙ্কমুক্ত করার কাজটি হযরত মুহম্মদ (সা)-এর দ্বারা সফল হয়েছে কি না এবং তিনি-ই সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত মহাপুরুষ কি না এবং অতীতের এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত লোকদিগকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ছলনমূলকভাবে ইঞ্জিলের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সুসংবাদ'-এর পরিবর্তে 'সুসমাচার'কে বেছে নিয়েছিলেন কি না, আশা করি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে তা অবশ্য বুঝতে পারবেন।

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের মধ্যে জ্ঞানী, চিন্তাশীল, স্থিরপ্রাজ্ঞ এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষের কোন অভাব নেই। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তাঁরা যদি উপরের এই আলোচনাটি নিয়ে ভাল করে ভেবে দেখেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই স্বীকার না করে পারবেন না যে, হযরত মুহম্মদ (সা)-এর দ্বারা বাইবেলের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি যথার্থরূপেই সফল হয়েছে এবং তিনিই সেই আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষ।

তাছাড়া তিনি যে বিশ্বনবী এবং ইসলাম যে বিশ্বধর্ম সে কথাও এ থেকে তাঁরা বুঝতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

ইসলাম যে সার্বজনীন তথা 'বিশ্বধর্ম' এবং শূদ্র-ভদ্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষেরই যে এতে প্রবেশাধিকার এবং সত্যিকারের ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলার পরিপূর্ণ সুযোগ রয়েছে, সে সম্পর্কে আমার খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদেরকে সুনিশ্চিতকরণের জন্যে একটি মাত্র উদাহরণকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

কোন ধর্মকে সত্য বলে জানা এবং তার সাহায্যে নিজেকে সত্যিকারের ধার্মিকরূপে গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই যে এক ধর্মের মানুষ অন্য

ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন অন্তত তা-ই যে স্বাভাবিক সে কথা খুলে বলার কোন প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

যিনি ধর্মের প্রেরণা এবং উন্নত জীবন লাভের আকুলতায় নিজের সহায়-সম্পদ, স্বজন-পরিজন প্রভৃতি সব কিছুকে পরিত্যাগ করেন, তিনি যে নিষ্পাপ হয়ে এক নবজীবন লাভ করেন সে সম্পর্কেও কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

যেহেতু নানা কারণে বা যে কোন কারণে সাধারণত অন্যদের পক্ষে এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হয়ে উঠে না; অতএব এসব ত্যাগী ব্যক্তিদেরকে অনন্যসাধারণ বলা হলে সেটা যে অন্যায় বা অতিশয়োক্তি হতে পারে না, সে কথাও সহজেই অনুমেয়। উপরের এসব কারণসমূহ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হলে নব-দীক্ষিতেরা যে ধামিক অন্তত ধর্মভীরু সেকথা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আর ধামিক ব্যক্তিরা যে সম্মানিত—অন্তত সম্মান পাওয়ার যোগ্য, আবহমানকাল ধরে সে কথা আমরা জেনে এসেছি।

অথচ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, নবদীক্ষিত খৃস্টানেরা আদি খৃস্টানদের দ্বারা নানাভাবে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। তাঁদেরকে সম্মানের অধিকারী তো নয়-ই এমনকি সমঅধিকারী বলেও মনে করা হয় না। তাছাড়া তথাকথিত আদি ও অভিজাত খৃস্টানদিগের উপাসনালয়, স্কুল, কলেজ, খানার মজলিস, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোনটাতে প্রবেশাধিকার পর্যন্ত তাঁদেরকে দেওয়া হয় না। উন্নত জীবন লাভের যে প্রেরণা নিয়ে তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেন তেমন জীবন লাভের কোন সুযোগও তাঁদেরকে দেওয়া হয় না।

নবদীক্ষিত হিন্দুদের অবস্থা এঁদের চেয়েও শোচনীয়। কেননা, প্রথমত হিন্দু ধর্মানুযায়ী অন্য ধর্মের মানুষকে দীক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁদের দৃষ্টিতে তাঁরা ব্যতীত বিশ্বের সকল মানুষই ম্লেচ্ছ, অসুর, বানর, রাক্ষস প্রভৃতি। আর্য সমাজিগণ কর্তৃক অধুনা দীক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হলেও নিজ নিজ ধর্মে থাকাকালীন এসব নবদীক্ষিতেরা যত উচ্চস্তরেই থাকুন না কেন, হিন্দু ধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁদেরকে হরিজন বা অচ্ছুৎদের শ্রেণীভুক্ত হতে হয়।

যেহেতু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেউ পূজার্চনার অধিকারী নয়, আর যেহেতু নবদীক্ষিতেরা ব্রাহ্মণ হতে পারে না এবং সে সুযোগ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই

নেই, অতএব পৈতৃক ধর্মে থাকাকালীন উপাসনা-আরাধনার যত সুযোগই তাঁরা পেয়ে থাকুন এখানে এসে তার কণামাত্র সুযোগও তাঁরা পান না—ধর্মীয় বিধানানুযায়ীই পেতে পারেন না—পাওয়া সম্ভবই নয়।

ফলে উন্নততর ধর্মীয় জীবন লাভের গভীর আকুলতা নিয়ে এবং সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এখানে এসে তাঁদেরকে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান, মানসম্মান প্রভৃতি সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। শুধু তা-ই নয়—অচ্ছুৎ হিসাবে বংশানুক্রমিকভাবে বর্ণ-হিন্দুদের অবহেলা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়ে জীবন কাটাতে হয়।

পক্ষান্তরে নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে এসব কোন সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয় না। তাঁরা মুচি, মেথর, ডোম, চাঁড়াল, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চাষী, ভদ্র, নিগ্রো, কাফ্রী প্রভৃতির যা-ই হোন, ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁরা শুধু নতুন জীবন এবং নতুন নামই লাভ করেন না—নতুন পরিচয়ও লাভ করেন।

অর্থাৎ অতীতে তাঁরা মর্যাদাবান-অমর্যাদাবান প্রভৃতি যা কিছুই থেকে থাকুন, এখানে এসে তাঁদের আর সে পরিচয় থাকে না। অতীতের সব কিছু ধুয়েমুছে গিয়ে নতুন নামের সাথে সাথে নতুন পরিচয়ও তাঁদের শুরু হয়ে যায়। তখন তাঁরা মুসলমান—সুতরাং বিশ্ব মুসলিমের সাথে একাকার, অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য।

অতীত জীবনে ধর্ম-কর্মাদি অনুষ্ঠানের কোন সুযোগ এবং অধিকার তাঁরা পেয়ে থাকুন অথবা না পেয়ে থাকুন, ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে সে সুযোগ এবং অধিকার তাঁরা পূর্ণ মাত্রায়ই পেয়ে যান! শুধু তা-ই নয়, অন্য মুসলমানদের মতো তাঁদের উপরেও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে উন্নততর ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলার যে আশা এবং আগ্রহ নিয়ে তাঁরা ধর্মান্তর গ্রহণ করেন সে আশা এবং আগ্রহ পূরণের সকল সুযোগই তাঁদের করায়ত্ত হয়ে থাকে।

সকলের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান এসব বাস্তব উদাহরণ ছাড়াও কৃষ্ণকায় কাফ্রী এবং এককালের ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রাঃ) এবং এমনি আরো অনেকের 'সাহাবী'র পদমর্যাদা লাভ প্রভৃতি বহু উদাহরণই ইতিহাসের পাতা থেকে টেনে আনা যেতে পারে।

ইসলামই যে সার্বজনীন তথা বিশ্বধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) যে বিশ্বনবী এবং গোটা বিশ্বের জন্যে আল্লাহ্‌র রহমতস্বরূপ—জানি না সে সম্পর্কে এর চেয়ে আর অকাট্য প্রমাণ কি থাকতে পারে।

এক যাত্রায় ভিন্ন ফল

সাধারণত এক যাত্রায় ভিন্ন ফল হওয়ার কথা নয় অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে তা হতে দেখা যায়। আর দেখা যায় বলেই কথাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। কি কারণে এবং কিভাবে এক যাত্রায় ভিন্ন ফল হয়ে থাকে সে সম্পর্কীয় আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভাল করে ভেবে দেখার জন্যে আমার খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

নানা কারণে পৈতৃক ধর্মের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরে যখন গ্রহণযোগ্য কোন ধর্মের সন্ধানে রয়েছি সে সময়ে জনৈক খৃস্টান বন্ধুর পরামর্শে তদানীন্তনকালে কলকাতার ইন্টালী এলাকায় বসবাসকারী রেভারেণ্ড জন ফেইতফুল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি।

তিনি আমার মনের কথা জেনে নিয়ে সরাসরি আমাকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে বলেন। এ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল স্থানাভাববশত এখানে সেগুলো তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। অতএব শুধু সারমর্মটুকু তুলে ধরা যাচ্ছে।

চিরাচরিত প্রথায় অন্য খৃস্টানদের মতো তিনিও আমার কাছে ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। যীশুখৃস্ট যে ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, অন্যতম ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা, আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস করা ছাড়া বিশ্ববাসীর জন্যে ত্রাণ লাভের বিকল্প কোন পথই যে আর নেই, নানাভাবে আমাকে সে কথা বোঝানোর চেষ্টাও তিনি করেন।

প্রায়শ্চিত্তবাদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম হলো: যেহেতু ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বের সকল মানুষের যাবতীয় পাপের জন্যে সকলের পক্ষ থেকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যীশুখৃস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে গেছেন—অতএব মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য নিজ নিজ পাপ মোচনের এই সুবর্ণ সুযোগটিকে গ্রহণ করা।

কিভাবে এই সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "যীশুখৃস্ট যে ত্রাণকর্তা এবং তিনি যে সকলের পক্ষ থেকে যাবতীয়

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন সে কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে যীশু এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান এই উভয়ের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করা পর্যন্ত এ সুযোগ লাভ সম্ভব নয়।

"অতএব কোন ব্যক্তি—সে যত বড় পাপীই হোক না কেন, উপরোক্ত রূপে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে যীশু এবং তার প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করা মাত্রই যাবতীয় পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। ফলে তাঁকে আর কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ, শাস্তিভোগ প্রভৃতি কোন কিছুরই সম্মুখীন হতে হয় না।

পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে আমি যখন খান বাহাদুর আলহাজ্জ আহ্‌সান উল্লাহ্ এবং মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখের সাথে আলোচনা করেছিলাম তখন তাঁদের একজনও সরাসরিভাবে আমাকে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন নি—বরং একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণের ফলে যে কঠোর সাধনা ও নিয়মানুবর্তিতার সম্মুখীন হতে হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমার মনে ভীতি এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা প্রত্যেকে যে কথাটির উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা এই ছিল যে, এই বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, প্রভু এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীও। আর আদেশ বা নির্দেশ দানের অধিকার যে একমাত্র প্রভুরই থাকে সেকথাও সর্বজনবিদিত এবং সর্বস্বীকৃত।

আর নির্দেশ মানা বা অমান্যকারীদের বিচার করা, ক্ষমা করা, শাস্তি এবং পুরস্কার দানের যোগ্যতা এবং অধিকারও যে একমাত্র প্রভুরই থাকে এবং তাই যে স্বাভাবিক, সে কথাও খুলে বলার কোন প্রয়োজন হয় না।

মোট কথা, তাঁরা আমার কাছে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে বেশ প্রাঞ্জল ও বোধগম্যভাবে তুলে ধরেছিলেন। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে অতঃপর খৃস্টধর্ম ও ইসলাম এ দু'টি ধর্মের ধর্মীয় দর্শনকে পাশাপাশি রেখে বিচার-বিবেচনা করা হলেই এই এক যাত্রায় ভিন্ন ফল কেন এবং কিভাবে হয়ে থাকে সে কথা বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি।

খৃস্টীয় ধর্মের ভিত্তি যে ত্রিত্ববাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে কথা সকলেরই জানা রয়েছে। আর ত্রিত্ববাদের সারকথা যে পিতা (স্বয়ং ঈশ্বর), পুত্র (যীশু

খৃস্ট) এবং পবিত্রাত্মা (গেব্রীয়েল)—এই তিনজন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, সে কথাও কারো অজানা নয়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যীশুখৃস্ট শুধু তিন-এর তৃতীয় বা অন্যতম ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্রই নন—তিনি ত্রাণকর্তাও।

এ ত্রিত্ববাদেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল প্রায়শ্চিত্তবাদ বা Doctrine of Atonement অর্থাৎ "যীশুখৃস্ট বিশ্বজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে গেছেন এবং তাঁর এই পবিত্র রক্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মাত্রই বিশ্বাস স্থাপনকারীর জীবনের যাবতীয় পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ফলে তার জন্যে পারলৌকিক জীবনে কোনরূপ হিসাব-নিকাশ বা শাস্তির প্রশ্নই থাকে না—এই কথার উপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই হল প্রায়শ্চিত্তবাদের মূল কথা।

এত দ্বারা যে বিষয়গুলি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো :

o বিশ্ব প্রভু ছাড়াও দু'জন স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর রয়েছেন এবং এই তিনজনের প্রতিই সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। (অথচ এটা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশ, যীশুখৃস্ট বলেছেন : "তোমরা একই সাথে ঈশ্বর এবং ধন—এ উভয়কে ভালবাসতে পার না। কেননা, তা হলে কোন সময়ে ধনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অবহেলার সৃষ্টি হতে পারে।" অতএব তিনজনের প্রতি সমভাবে বিশ্বাস পোষণ যে শুধু অসম্ভবই নয়—যীশুখৃস্টের শিক্ষারও পরিপন্থী সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না —লেখক)।

o সদাপ্রভু বা আসল ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। কেননা মানুষকে ত্রাণ করার কোন অধিকারই তাঁর নেই—এ অধিকার একান্ত-রূপেই যীশুখৃস্টের করায়ত্ত। অথচ ত্রাণ বা যে কোন এক বা একাধিক ক্ষমতা থেকে যিনি বঞ্চিত তাঁকে কোনক্রমেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যেতে পারে না।

o এভাবে ত্রাণের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে বিচারের কর্তৃত্বও যে বিশ্বপ্রভুর হাতছাড়া হয়ে গেছে, সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, বিচারের কর্তা যিনি অপরাধীকে শাস্তি দান, ত্রাণ, রেহাই বা ক্ষমা করা, পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি ক্ষমতা এবং অধিকারও একমাত্র তাঁরই থাকতে পারে এবং তা-ই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও একথা বলে যে, বিচার এবং ত্রাণের কর্তা ভিন্ন হলে বিচারক অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবেন আর ত্রাণকর্তা বিনা বিচারে তাকে ছেড়ে দেবেন—অন্তত বিচারের কাজ এভাবে চলতে পারে না। অন্যদিকে যেহেতু যীশুখৃস্ট বিশ্বের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন, আর যেহেতু এই প্রায়শ্চিত্তবাদের সুযোগে অন্তত খৃস্টীয় জগতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অসংখ্য-অগণিত মানুষ পাপমুক্ত হওয়ার ফলে তাঁদেরকে আর বিচারের সম্মুখীনই হতে হচ্ছে না—এমতাবস্থায় বিশ্বপ্রভু যে অন্তত খৃস্টজগতের বিচারকর্তা নন, সে কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে অর্থাৎ খৃস্টীয় জগতের কাছে বিশ্বপ্রভু আর যা কিছুরই কর্তা বলে বিবেচিত হোন না কেন, ত্রাণ এবং বিচারের কর্তা যে নন, সে কথাই এতদ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই হল খৃস্টানদের ধর্মীয় দর্শনের মোটামুটি পরিচয়। অতঃপর ইসলামের ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ইসলামের মূল কথা হল এই বিশ্ব নিখিলের যিনি স্রষ্টা, তিনি শুধু স্রষ্টা-ই নন সর্ব-শক্তিমান, ইচ্ছাময়, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী, বিচারকর্তা, প্রভু এবং প্রতিপালকও তিনি-ই। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি একাই পরম, একাই চরম এবং তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ মাত্রই সবকিছু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর যে কোন সহকারী-সাহায্যকারী, অংশীদার-সমকক্ষ প্রভৃতি থাকতে পারে না। থাকা যে সম্ভব-ই নয় সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব—পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সৃষ্টির সেরা বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হয়ে গড়ে উঠার জন্যে এই পৃথিবীই হল তার কর্মক্ষেত্র। সে জন্যেই পৃথিবীকে 'পরকালের শস্যক্ষেত্র' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যা রোপণ বা বপন করা হবে, হুবহু তার-ই ফল বা ফসল সেখানে পাওয়া যাবে। মোট কথা, এখানে আদর্শ মানুষ বা আল্লাহ্‌র যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে গড়ে উঠা বা না উঠার উপরেই তথাকার পুরস্কার বা শাস্তি একান্তরূপেই নির্ভর করছে।

মানুষকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হতে পারে, স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ হিসাবে একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে সেকথা পরিজ্ঞাত রয়েছেন। আর মানুষ যে ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয় এবং

মনগড়া পথে চলতে গিয়ে মানুষ যে তার নিজের এবং আরো অনেকের সর্বনাশ ঘটাতে পারে, নিশ্চিতরূপেই সে কথাও তার অজানা নয়।

অন্যদিকে প্রভু হিসাবে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান প্রবর্তনের যোগ্য অধিকারীও একমাত্র তিনিই। সে কারণে মানুষের জন্যে তিনি এক পরিপূর্ণ জীবন-বিধান প্রবর্তন করে উক্ত জীবন-বিধানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "একমাত্র আমার দাসত্ব করার উদ্দেশ্যেই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি।" এমতাবস্থায় একটি মুহূর্তের জন্যেও কোনভাবে, কোন অবস্থায় এবং কোন অজুহাতে অন্য কারো আদেশ মেনে চলা বা দাসত্ব করার সুযোগ যে কোন মানুষেরই নেই সেকথা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য যে, অন্যত্র তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছেন। দাসত্ব ছাড়া প্রতিনিধিত্ব যে সম্ভব নয় এতদ্বারা সে কথাই বোঝানো হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে যে কথা বলা প্রয়োজন, তা হল তাঁর সত্যিকারের দাস বা সত্যিকারের প্রতিনিধিরূপে গড়ে উঠার অর্থই হল—সৃষ্টির সেরা বা আদর্শ মানুষরূপে গড়ে উঠা। আর ইসলামী জীবন-বিধানে রয়েছে এই গড়ে উঠারই প্রেরণা ও পথনির্দেশ।

সেখানে বলা হয়েছে : সৃষ্টির সেরা হয়ে গড়ে উঠার স্বার্থেই মানুষের মধ্যে লোভ-লালসাদি রিপুনিচয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং ভোগের সামগ্রী ও লোভের উপকরণসমূহকে আকর্ষণীয়ভাবে চারদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

নিশ্চিতরূপেই মানুষের জন্যে এ এক মহাপরীক্ষা। সাফল্যের সাথে নশ্বর পার্থিব জীবনের এ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপরেই নির্ভর করছে অবিনশ্বর সেই অপার্থিব জীবনের মহাপুরস্কার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরীক্ষা যত বেশী কঠোর হয়, সাফল্যের গৌরব এবং মর্যাদাও তত বেশী হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বিবেক-বুদ্ধির তাকীদ, চারদিকে ছড়ানো বাস্তব নিদর্শন-সমূহ, ইতিহাসের শিক্ষা, ধর্মীয় বিধানের কঠোর ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রভৃতিকে উপেক্ষা-অবহেলা করে যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবনকেই সর্ব-তোভাবে আঁকড়ে ধরবে, সুনিশ্চিতরূপেই সে ব্যক্তি তার পারলৌকিক

জীবনের জন্যে এক মহা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকেই করে তুলবে অলংঘ্য ও অবধারিত।

আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত না করে—যেহেতু উন্নত ও আদর্শ জীবন গড়ে তোলা মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। অতএব এ দু'টি ধর্মীয় দর্শনকে স্মৃতিপটে জাগরূক রেখে অতঃপর ধরে নেওয়া যাক যে, উন্নত ও আদর্শ জীবন গড়ার প্রয়োজনে ধর্মান্তর গ্রহণ অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় দু'ব্যক্তি এই একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একজন খৃস্টধর্ম এবং অন্য জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

যে ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল সে ব্যক্তি যে পারলৌকিক জীবনের স্বার্থে এ জীবনকে উন্নত ও আদর্শ করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হবে না—এমনকি সে প্রয়োজনই বোধ করবে না, সে কথা সহজেই অনুমেয়। কেননা, সে এ কথাকে বেশ ভালভাবেই তার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যে, "পারলৌকিক জীবনের হিসাব-নিকাশ বা শাস্তি ভোগের কোন প্রশ্নই আমার নেই, ত্রাণকর্তা, অন্যতম ঈশ্বর এবং 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' যীশুখৃস্টই স্বয়ং আমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।"

এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যে পরকালের চিন্তা বাদ দিয়ে পেট ও প্রবৃত্তির তাড়নায় একান্তরূপেই এই পার্থিব সম্পদের আহরণ ও উপভোগের কাজে আত্মনিয়োগ করবে সুনিশ্চিতরূপেই সে কথা বলা যেতে পারে। আর এটা যে সে করবেই সে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে অন্যত্র যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

অবশ্য সেজন্যে আদি বা পুরাতন খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ অথবা নবদীক্ষিত খৃস্টানদেরকে মোটেই দায়ী করা যেতে পারে না। কেননা, যীশুখৃস্টের আদর্শে জীবন গড়তে হলে মানুষকে ঘরসংসার, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, অর্থোপার্জন প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে শুধু নিদারুণ দুঃখ-কষ্টকেই বরণ করে নিতে হয় না—সমূলে নির্বংশও হয়ে যেতে হয়। সুতরাং ইচ্ছা করে অন্তত নির্বংশ হয়ে যাওয়ার পথ কেউ বেছে নিতে পারে না।

অন্যদিকে বাইবেলের বর্ণনা এবং খৃস্ট জগতের বিশ্বাসানুযায়ী যীশুখৃস্ট হলেন ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, মৃতের জীবনদাতা এবং

আরো অনেক কিছু! অর্থাৎ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে—উর্ধ্ব-জগতের এক অনুপম অতুলনীয় মহান সত্তা।

এমতাবস্থায় কোন মানুষের পক্ষে তাঁর চরিত্রকে নিজেদের জীবন গড়ার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা শুধু অসম্ভবই নয়—কল্পনাতীতও। অতএব অন্তত এই দু'টি অবস্থার জন্যে একান্ত বাধ্য হয়েই 'যেমন খুশী তেমন চল' এই নীতি গ্রহণ করা ছাড়া কোন গত্যান্তরই থাকে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি এবং পারলৌকিক শাস্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই যে 'পরকালের শস্যক্ষেত্র' রূপী এই পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে আদর্শ মানুষ বা আল্লাহ্‌র যোগ্য প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং তা-ই যে স্বাভাবিক, আশা করি আপনাদের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কাছে সে কথা খুলে বলার কোন প্রয়োজনই হবে না।

অবশ্য এ কাজে তার বিশেষ দু'টি সুযোগও রয়েছে। একটি হল—তার সম্মুখে রয়েছে আল্লাহ্‌র দেয়া এমনই এক অনবদ্য জীবন-বিধান, যা একান্তরূপেই সহজ-সরল এবং সকল প্রকার ভুলত্রুটি, আবিলতা প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

আর অন্যটি হল—এমনই এক মহাপুরুষের জীবনাদর্শ—যিনি শুধু বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সা)-ই নন—মানবতার এক সুমহান আদর্শও। নিজেকে ঈশ্বরের অংশ, অবতার, সমান, সন্তান বা অতিমানব, মহামানব প্রভৃতির কোনটা বলেই তিনি দাবী করেন নি। কারণ, সে সবের কোনটা-ই তিনি ছিলেন না। সর্বতোভাবেই তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ—মানুষের আদর্শ। মানুষের আদর্শ করেই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। মানুষই মানুষের আদর্শ হতে পারে এবং তা-ই যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক, আশা করি সে সম্পর্কে আপনা-দের কাছে কোন উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না।

বলা বাহুল্য, এমন এক অনবদ্য জীবন-বিধান এবং এমন এক সুমহান আদর্শকে আঁকড়ে ধরার ফলে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে না উঠে পারে না। এক যাত্রার কেন এবং কিভাবে ভিন্ন ফল হয়ে থাকে সে কথা এ থেকে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

আমার প্রিয় খৃস্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! বিদায়ের পূর্বে ভাল করে ভেবে দেখার জন্যে শেষবারের মতো আর দু'টি মাত্র কথা আপনাদের কাছে রেখে যেতে চাই ঃ

ইসলাম—আর ইসলামের কথাই বা বলি কেন; সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিও একথাই বলে যে, মানুষের দ্বারা মোটামুটি দু'ভাবে পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। এক. সৃষ্টিকর্তার আদেশ লংঘন; দুই. সৃষ্ট জীবের ক্ষতি সাধন।

বলা বাহুল্য, যাঁর আদেশ লংঘন এবং যাঁর বা যাঁদের ক্ষতি সাধনের ফলে পাপ সংঘটিত হয় একমাত্র তিনি বা তাঁরাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করার অধিকারী অর্থাৎ তিনি বা তাঁরা ক্ষমা না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন-ক্রমেই পাপ থেকে ত্রাণ লাভ করতে পারে না।

এমতাবস্থায় কেউ যদি কোনভাবে যীশুখৃস্টের ক্ষতি সাধন করে পাপী হয়ে থাকে, তবে একমাত্র সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করা এবং ত্রাণ লাভের সুযোগ করে দেওয়ার অধিকার যীশুখৃস্টের থাকতে পারে।

কিন্তু যারা সৃষ্টিকর্তার আদেশ লংঘন অথবা কোন মানুষ বা কোন জীবের ক্ষতি সাধন করে পাপী হয়, তাদের সকলের জন্য এমন পাইকারীভাবে প্রায়শ্চিত্তকরণ, ত্রাণদান বা পাপমুক্তকরণের কোন অধিকারই যীশুখৃস্টের থাকতে পারে না।

অথচ অতীতে পাদ্রী-পুরোহিতগণ যীশুখৃস্টের এই অধিকার থাকার এক মনগড়া দলীল আপনাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন।

তাঁদের এ সম্পর্কীয় দলীলটি যে অন্য অনেক দলীলের মতো মনগড়া, যুক্তিহীন এবং স্ববিরোধী সে কথা যে আপনারা বুঝেন না, তা নয়। কিন্তু নানা কারণে সব কিছু বুঝেও আপনাদেরকে অবুঝ সাজতে হয়েছে।

অন্য অনেক দলীলের মতো তাঁদের এ দলীলটিও যে মনগড়া, যুক্তিহীন এবং স্ববিরোধী যে সম্পর্কে ভাল করে ভেবে দেখার সুবিধা হবে বলে বিষয়টির উপরে কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে ঃ

বলা হয়ে থাকে ঃ "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে মানব জাতির আদি পিতা পাপী হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ তথা গোটা মানব জাতিই জন্মগতভাবে পাপী।"

"যেহেতু কোন পাপী মানুষের দ্বারা অন্য কোন পাপী মানুষের ত্রাণ, পাপ মোচন বা প্রায়শ্চিত্তকরণ সম্ভব নয় অতএব পাপিষ্ঠ মানব জাতির পাপ মোচন বা পরিত্রাণ দানের জন্য সদাপ্রভু (ঈশ্বর) তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু-খৃস্টকে নিজের ঔরসে জন্মদান করেন। আর যেহেতু যীশুখৃস্ট আদি পিতা বা কোন মানুষের ঔরসজাত নন অতএব তিনি নিষ্পাপ এবং মানব জাতির ত্রাণকর্তা।"

অতীতের পাদ্রী-পুরোহিতগণ কর্তৃক যীশুখৃস্টকে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক এবং ত্রাণকর্তা বানানোর এই যুক্তি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা, প্রথমত. স্বেচ্ছাকৃতভাবে পাপ বা পুণ্য কাজের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন মানুষ পাপী বা পুণ্যবান বলে অভিহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত. শিশুরা যে নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক আবহমানকাল ধরে এটা সর্ব-বাদীসম্মত সত্যরূপে গৃহীত হয়ে আসছে।

তৃতীয়ত. অতীব জঘন্য ধরনের পাপী মানুষদের ঔরসে অতি পুণ্যবান এমনকি প্রখ্যাত মহাপুরুষের এবং অতি পুণ্যবান মানুষের ঔরসে পাপিষ্ঠ নরাধমের জন্ম অহরহই আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি। এমতাবস্থায় জন্মসূত্রে পাপী বা পুণ্যবান হওয়াকে সত্য এবং বাস্তবসম্মত বলে আমরা মেনে নিতে পারি না।

চতুর্থত. যীশুখৃস্টকে সদাপ্রভুর 'ঔরসজাত' একমাত্র পুত্র বলা হলেও বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তাঁর জন্ম হয়েছিল—'পবিত্রাত্মা বা গেব্রীয়েলের' দ্বারা। অতএব তাঁকে সদাপ্রভুর ঔরসজাত বলাটা যে বাইবেল বিরোধী এবং পাদ্রী-পুরোহিতদেরই উদ্ভট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্পনা সেকথা অতি সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ঔরসজাত না হলে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না—পিতৃসম্পদেরও অধিকারী হওয়া যায় না।

পঞ্চমত. প্রায়শ্চিত্তবাদ তথা যীশুখৃস্ট কর্তৃক ক্রুশে প্রাণদানের মাধ্যমে খৃস্ট-জগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণের এই থিওরী খোদ খৃস্টানগণই বিশ্বাস করেন না।

কেননা যদি বিশ্বাস করতেন তবে চোর, ডাকাত, খুনী প্রভৃতি পাপীর বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য আইন, আদালত, জেলখানা, ফাঁসির মঞ্চ প্রভৃতির অস্তিত্ব অন্তত তাঁদের দেশে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

খোদ যীশুখৃস্ট যাদের পাপের জন্যে আগাম প্রায়শ্চিত্ত করে তাদেরকে নিষ্পাপ বা পাপমুক্ত করে গেছেন বলে দাবী করা হয়ে থাকে তাঁদেরকে পাপী সাব্যস্তকরণ ও শাস্তি প্রদান যে শুধু স্ববিরোধীই নয় বরং গোটা প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং খোদ যীশুখৃস্টের জন্যেও অতি জঘন্যভাবে অবমাননাকর সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ষষ্ঠত. যীশুখৃস্ট বা অন্য কেউ যে সদাপ্রভুর ঔরসজাত হতে পারেন না অন্তত যীশুখৃস্ট যে তাঁর ঔরসজাত 'একমাত্র পুত্র' নন খোদ বাইবেল থেকে তার কতিপয় প্রমাণ তুলে ধরা যাচ্ছে:

o ইস্রাইল (আঃ) অর্থাৎ বাইবেলের ভাষায় যাকোবকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, যথা: And thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn.

—Exodus 4 : 22

অর্থাৎ আর তুমি ফারাওকে কহিবে, সদা প্রভু এই কথা কহেন, ইস্রাইল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত।

o ডেভিড (দাউদ আঃ)-কেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, যথা: I will declare the decree : the Lord hath said unto me Thou Art my son this day have I begotten thee.

—Psalms 2 : 7

অর্থাৎ আমি সেই বিধির বৃত্তান্তপ্রচার করিব; সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র; অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।

o সলোমন (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

He shall build a house for my name, and he shall be my son, and I will be his father and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

—Chronicles 22 : 10

অর্থাৎ সে (সলোমন) আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে। আর সে আমার পুত্র হইবে, আমি তাহার পিতা হইব এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজসিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির করিব।

এ নিয়ে উদ্ধৃতির সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। তার প্রয়োজনও নেই, কেননা যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র হওয়া সম্পর্কে পাদ্রী-পুরোহিতদের

দাবী যে মিথ্যা এবং বাইবেল-বিরোধী এই কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বলা বাহুল্য, উপরের এই উদ্ধৃতির মধ্যে পুত্র, সন্তান, ঔরসজাত প্রভৃতি শব্দের কোনটাই আসল অর্থজ্ঞাপক নয়। ভালবাসা, ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু প্রখ্যাত নবী-রসূলের বেলায়ই নয়—অন্য ধরনের মানুষদের বেলায়ও এসব শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার বহু প্রমাণ বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এ সম্পর্কীয় দু'টিমাত্র উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

o যারা শত্রুকে ভালবাসে তাদেরকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। যথা ঃ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে তাড়না করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও। যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।

—মথি ৫ ঃ ৪৪—৪৫

o অনুরূপভাবে শান্তি স্থাপনকারীদেরকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। যথা ঃ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।

—মথি ৫ ঃ ৯

এসব উদ্ধৃতি থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, যীশুখৃস্টের পুত্রত্ব অর্থাৎ সদাপ্রভুর ঔরসজাত একমাত্র পুত্র হওয়ার যত দাবীই পাদ্রী-পুরোহিতগণ করুন না কেন, আসলে তা ভিত্তিহীন, স্বকপোলকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আর পুত্রত্বের দাবীই যদি সত্য না হয়, তবে যে পাদ্রী-পুরোহিতদের ত্রাণবাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদ, স্বর্গারোহণবাদ প্রভৃতি সবকিছুই মাঠে মারা যায়; আশা করি এ সহজ-সরল কথাটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন।

উপসংহার

ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেসব কারণে আমি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিনি সে কারণগুলোকে মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি লেখক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত প্রভৃতির কোনটাই নই। তাই বিষয়বস্তুকে যেভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল, আমার অযোগ্যতার জন্যে সেভাবে তুলে ধরতে পারিনি বলে বিশেষভাবে দুঃখিত।

পরিবেশের শিকার আধুনিককালের খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ বা অন্য কারো বিশ্বাস বা অনুভূতিতে সামান্যতম আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না, তথাপি আমার অযোগ্যতার জন্যে কারো মনে আঘাত লাগার মতো কিছু যদি লিখে থাকি সে জন্যে আমি বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করলেও উক্ত ধর্ম বিশেষ করে বাইবেলের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী হয়ে রয়েছি। কারণ উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলাম।

কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বাইবেল থেকেই সর্বপ্রথমে আমি সে কথা জানতে পারি।

বাইবেল নতুন ও পুরাতন নিয়ম, বিশেষ করে যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৬ অধ্যায়ে (১৪ ঃ ১৬—১৭; ১৪ ঃ ২৫-২৬; ১৪ ঃ ৩০; ১৫ ঃ ২৬; ১৬ ঃ ৭; ১৬ ঃ ১২-১৫;) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে যে সব কথা লিখা রয়েছে, সেগুলো আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে. আমি সম্ভাব সূত্রসমূহ থেকে তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করতে থাকি।

বিশেষভাবে চেষ্টা সাধনার পরে 'Muhammad in world scriptures' এবং ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় এম, এ, (রিসার্চ স্কলার প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রণীত 'বেদ পুরাণে হযরত মুহাম্মদ' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের সুযোগ আমি লাভ করি।

বিভিন্নজনের লেখা তাঁর পবিত্র জীবনচরিত লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা-পদ্ধতি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যে, শুধু অতীতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিধানসমূহই নানা কারণে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হয়নি ওসবের ধারক এবং বাহকগণসহ পৃথিবীতে যত ধর্মীয় মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের জীবনচরিতসমূহ ও যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলন সংরক্ষণের অভাব, অতিভক্তি ও অন্ধভক্তির প্রাবল্য, সময়ের ব্যবধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির জন্য অদ্ভুত, অলৌকিক ও অতি-মানবিক কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

একমাত্র মুসলমানগণই যে অক্লান্ত সাধনায় পবিত্র কোরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনীকে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন গভীরভাবে চিন্তা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সে বিশ্বাস আমার মনে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

আমি দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বুঝতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই একমাত্র মহাপুরুষ—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁর জীবনী অনুসরণ করে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে উঠা সম্ভব।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, অতীতের মতো তিনি শুধু একজন স্বর্গীয় মহাপুরুষই ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন ধর্মোপদেষ্টা, সংসারী, বিরাগী, সমাজ সেবক, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, বাগ্মী, রাষ্ট্র-পরিচালক, সংগঠক, ত্যাগী, সংযমী, ধৈর্যশীল, একনিষ্ঠ ধার্মিক প্রভৃতি, আর এ সবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এখানে অন্য যে বিষয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন তা হলো :

গ্রহণযোগ্য একটি ধর্ম খুঁজতে গিয়ে যখন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছি, তখন আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, আবহমানকাল ধরে ধর্মের নামে পৃথিবীতে নরহত্যা, নারী নির্যাতন, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে কন্যা নিক্ষেপ, নবজাত কন্যা সন্তানকে হত্যা অথবা জীবন্ত প্রোথিত-করণ, মদ্যপান, গাঁজা-ভাং আফিম সেবন, ব্যভিচার, উলঙ্গপনা, জুয়াখেলা,

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবহেলা, জাতিভেদ, শোষণ-নির্যাতন প্রভৃতি অতীব জঘন্য ও মানবতা বিরোধী কাজগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

শুধু তা-ই নয়—ভিন্ন ভিন্ন এতগুলি ধর্ম প্রচলিত থাকার কারণেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও সংঘাত-সংঘর্ষ চালু রয়েছে এবং চির-কালই চালু থাকবে।

অবস্থা দৃষ্টে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, ধর্মই এসব কিছুর জন্য দায়ী।

মজার ব্যাপার হলো—প্রতিটি ধর্মের মানুষই তার নিজ নিজ ধর্মকে আদি-অকৃত্রিম, সত্য-সনাতন ও স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত বলে দাবী করে থাকে। এমতাবস্থায় অর্থাৎ সকলের দাবী যদি সত্য হয়, তবে ধরে নিতে হয় যে, পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অনাচার, পাপ-দুর্নীতি ও সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটেছে এবং আবহমানকাল ধরে ঘটতে থাকবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই এসবের জন্য দায়ী ; কারণ তিনিই ভিন্ন ভিন্ন এতগুলি ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

অথচ বিশ্বস্রষ্টার মতো সুমহান সত্তা যে এমন জঘন্য কাজ করতে পারেন কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিই একথা মেনে নিতে পারে না।

এই না পারার অন্য কারণও রয়েছে। তা হলো : প্রতিটি বিবেক প্রতি-নিয়ত প্রত্যক্ষ করে চলেছে যে, বিশ্বস্রষ্টা একটি মাত্র প্রাকৃতিক বিধানের দ্বারা আবহমানকাল যাবত জীব-জড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, অণু-পরমাণু নির্বিশেষে নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি সৃষ্টিকে অতীব সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে চলেছেন।

এমতাবস্থায় শুধু মানব জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এতগুলি ধর্মের উদ্ভব তিনি ঘটাতে যাবেন কেন?

সুখের বিষয় ইসলাম-ই এই প্রশ্নের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য উত্তর দিয়েছে। আর তা হলো : তিনি মানব জাতির জন্য একটি মাত্র ধর্মেরই উদ্ভব ঘটিয়েছেন। মানুষেরাই তাকে ভিন্ন ভিন্ন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে। পবিত্র কুরআনের এ সম্পর্কীয় কতিপয় বাণীর হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"শুরুতে সব মানুষই এক দলভুক্ত ছিল। তার পরে বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিল। আল্লাহ্ তখন একের পর এক নবী পাঠাতে লাগলেন। তাঁহারা ভাল কাজের জন্য সুসংবাদ দিতেন এবং (মন্দ কাজের বিরুদ্ধে) সতর্ক করিতেন। তাহার উপরে তাঁহাদের সঙ্গে আল-কিতাব (ওহী-সংকলন) অবতীর্ণ করেন। মানুষ যেসব ব্যাপার লইয়া ঝগড়া করে উহা তাহারই মীমাংসা-বিধান।"

—কুরআন ঃ ২ ঃ ২১৩ (মওঃ আবুল কালাম আযাদের 'উন্মুক্ত কুরআন'

"হে নবীগণ! পবিত্র দ্রব্য আহার করুন এবং সৎ কার্যে তৎপর থাকুন। আপনারা মূলত একই দলভুক্ত, আমি আপনাদের প্রভু। সুতরাং আপনারা আমাকে ভয় করিয়া চলুন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষেরা পরস্পর মতানৈক্য করিয়া নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেই তাহারা পরিতুষ্ট (বোধ করিতেছে)।"[১]

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদিগকে একজন নর ও একজন নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সম্প্রদায় ও গোত্র রূপে স্থাপন করিয়াছি। (তাহা এই জন্য যে) তোমরা একে অন্যের হক, দায়িত্ব এবং অধিকার বুঝিবে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে যে যত বেশী সৎ-কর্মশীল আল্লাহ্র নিকট সে তত মহৎ (বলিয়া বিবেচিত)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ই অবগত রহিয়াছেন।"[২]

"—বাস্তবিক এই তো তোমাদের জাতি। একমাত্র জাতি এবং আমি তোমাদের একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালক, অতএব আমারই উপাসনা কর।"[৩]

"আর (দেখ) তোমাদের এই জাতিগুলি মূলত একই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। সুতরাং (আমারই অর্চনার পথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং) একমাত্র আমাকেই ভয় করিয়া চল এবং সৎকার্যে তৎপর থাক।"[৪]

"(হে রাসূল!) আপনার আগের জাতিগুলির খবর জানিতে পান নাই। নূহের কওম, আদ ও সামূদ কওম এবং তাহাদের পরবর্তী এরূপ অসংখ্য কওম যাহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও জানা নাই, এই

১. কুরআন ২৩ ঃ ৫১-৫৩।
২. কুরআন ৪৯ ঃ ১৩।
৩. কুরআন ২১ ঃ ৯২।
৪. কুরআন ২৩ ঃ ৫২।

সকল কওমের ভিতরে সত্যের আলোক-বাহী রূপে নবী-রসূল আবির্ভূত হইয়াছেন। অথচ তাহারা মূর্খতা ও অহংকারে ডুবিয়া তাঁহাদের শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।"[১]

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।"[২]

"নিশ্চয় ইহাই (ইসলাম) একমাত্র সত্য ও সুদৃঢ় পথ (তোমরা সকলে) ইহারই অনুসরণ কর এবং শয়তানের আনুগত্য করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। (কেননা) সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩]

বলা বাহুল্য, ইসলাম যে বিশ্বধর্ম এ থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে যে, ইসলামের মূল কলেমা একটি-ই। বিশ্বের আদি-মানব থেকে শুরু করে সকল নবী-রসূলই এই একমাত্র কলেমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সন্দেহ ও বিতর্কের অবকাশ থেকে যাবে বলে এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ধর্মীয় বিধানসমূহের অনেক শিক্ষাই পরবর্তীকালে যুগের অনুপযোগী হওয়ার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে; পাঠকবর্গ সে কথা অবশ্যই মনে রেখেছেন।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ধর্ম যদি সত্য হয়, আর সত্য যদি সনাতন এবং চিরন্তন হয়, তবে তা কি করে যুগের অনুপযোগী হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর হলো ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের দু'টি অংশ রয়েছে—একটি মূল, আর অন্যটি—শাখা-প্রশাখা বা সেই মূলে উপনীত হওয়ার পথ-পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ প্রভৃতি।

ইসলামী পরিভাষায় এসবকে যথাক্রমে দীন এবং শরা বা শরীয়ত বলা হয়ে থাকে। 'দীন' শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য হলো—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রভু বা উপাস্য নেই—অন্তরের সাথে সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা। অন্য কথায় 'দীন' অর্থ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-বিধান।

বলা বাহুল্য, জীবন পরিচালনার বিষয়টি খুবই ব্যাপক ও জটিল। খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপায়-উপার্জন, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির

১. কুরআন ঃ ৪ ঃ ১৬৩—১৬৪।
২. কুরআন ঃ ৩ ঃ ১৮।
৩. কুরআন ঃ ২১ ঃ ৩০।

নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় সকল দেশে এবং সব রকম পরিবেশে এগুলি একই রূপ হতে পারে না—হওয়া সম্ভবই নয়।

সে কারণেই ভিন্ন ভিন্ন নবী-রসুলদের দীন চিরদিনই এক, অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয় থাকলেও শরীয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, শেষ নবী (সা)-র সময়ে শুধু দীনকেই পরিপূর্ণতা দেওয়া হয়নি —যুগের অবস্থা, মানুষের মন-মানস, প্রয়োজন-পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি অনুকূল হওয়ায় শরীয়তকেও পরিপূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দীনের মত শরীয়তও অপরিবর্তিত থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে ইসলাম যে বিশ্বধর্ম সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ বা দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু উচিত না হলেও দ্বিমত ও সন্দেহ সৃষ্টির কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্পর্কে দু'চারটি উদাহরণ তুলে ধরা হলে বিষয়টি সহজবোধ্য হবে বলে আশা করি।

আমার পূর্বতন কতিপয় আত্মীয়-স্বজনদের ছাড়াও অন্তত ভিন্ন ভিন্ন আর তিনটি ধর্মের কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে ধর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং বাদানুবাদকালে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা সকলেই প্রথমত ধর্ম যে একটি-ই সে কথার উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে সেটি যে তাঁদের নিজের ধর্মটি ছাড়া অন্য কোনটি নয় সে দাবীও তাঁরা প্রত্যেকেই সমান তালে এবং সমান দৃঢ়তার সাথে করতে থাকেন।

এ পর্যায়ে সুযোগ বুঝে তাঁদের কেউ কেউ বেশ জোরের সাথে এ মন্তব্যও করেছেন যে, "সব ধর্মের মূলই যখন এক তখন ধর্মান্তর গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের এই দাবী খণ্ডন করার সাথে সাথেই আকস্মিকভাবে তাঁরা মোড় পরিবর্তন করেন এবং বলতে থাকেন "আসল কথা হল—সব ধর্মের মূলই এক।"

কেউ কেউ এ কথার সমর্থনে চোখেমুখে বেশ বিজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলেছেন—"আল্লাহ্-ঈশ্বর, রাম-রহীম, কুরআন-পুরাণ, দীন-ধর্ম, সত্য পীর, সত্য নারায়ণ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি শুধু নামের পার্থক্য এবং বুঝের ভুল—মূলে কোন পার্থক্যই নেই। যারা অজ্ঞ অনুদার তারাই শুধু এ নিয়ে হৈ চৈ করে।"

কেউ কেউ আবার 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর' বলে ধর্ম নিয়ে কোনরূপ আলোচনাকেই অন্যায় ও অসঙ্গত বলে মন্তব্য করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমানকে 'এক মায়ের সন্তান' বলে প্রচারণা চালাতে এবং 'বন্দে মাতরম' ও 'আল্লাহু আকবর'-কে এক সাথে মিলিয়ে মুসলমানকেও দেশমাতৃকার পূজাতে পরিণত করে অচ্ছুৎদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে দেখা গেছে।

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই ছিল অজ্ঞতা-প্রসূত অথবা সুপরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস। বিভিন্ন মহল থেকে দ্বিমত এবং সন্দেহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা যে চালানো হয়েছে এবং হয়ে চলেছে আশা করি সে সম্পর্কে আর কোন উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না।

তবে অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে, এঁদের কার্যক্রম অজ্ঞতা-প্রসূত অথবা সুপরিকল্পিত যাই হোক সুস্পষ্টরূপেই তার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমান বিশেষ করে তাঁদের কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন একই সুরে 'সব ধর্মের মূলই এক' বলে মন্তব্য করেন তখন শুধু যে তার অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না তা-ই নয়—রীতিমত বিস্মিত এবং হতাশাগ্রস্তও হয়ে পড়তে হয়।

যাঁরা পূর্বোক্তদের মতো অজ্ঞতার জন্যে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এটা করেন বোধগম্য কারণেই তাঁদের অজ্ঞতা নিরসন বা সৎপথ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে থাকে বলে সেদিকে না গিয়ে যাঁরা সদিচ্ছা-প্রণোদিত বা সত্যোপলব্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করে থাকেন তাঁদের চিন্তার খোরাক হিসেবে অতি বিনয়ের সাথে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই। সে কথাগুলি হলো ঃ

০ 'সব ধর্মের মূলই এক' এখানে 'সব ধর্ম' বলতে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বলে পরিচিত সব ধর্মকেই বোঝায়। এর মাঝে মানুষের স্বকপোলকল্পিত ধর্মগুলিও রয়েছে। অতএব, এতদ্বারা আসল ও নকলকে একাকার করে ফেলা হয়। সুতরাং কোন মুসলমান এমনকি সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে 'সব ধর্মের মূল এক' বলে আসল ও নকলকে একাকার করে ফেলা শোভন, সঙ্গত এবং বিজ্ঞজনোচিত কাজ হতে পারে না।

০ যদি বলা হয় যে, নকল বা স্বকপোলকল্পিতগুলির কথা বাদ দিয়েই এ মন্তব্য করা হয়ে থাকে তাহলে আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাবো যে, নকল বা স্বকপোলকল্পিত ধর্মগুলির সুদীর্ঘকাল থেকে চালু থাকা এবং স্বার্থপরতা ও ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সত্য বা আসল ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও সেগুলিতে নানা ধরনের আবিলতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে যে অবস্থার

সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি নকল তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় নকল বা স্বকপোলকল্পিত ধর্মগুলিকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হলেও কার্যত তা সম্ভব নয়। আর যদি সম্ভব না হয় তা হলে এরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকাই শোভন, সঙ্গত এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

০ 'সব ধর্ম' বলতে যদি সত্য ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে যেগুলোকে ধর্ম বলে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলোর কথা বোঝানো হয় তবে আমার অনুরোধ যে, যেহেতু সেগুলোর সংখ্যা এবং পরিচয় জানা সম্ভব নয়—অতএব সেগুলোর কোন্ কোন্‌টি সত্য ধর্মের খণ্ডিত অংশ আর কোন্ কোন্‌টি নয়, তা নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে না। এমতাবস্থায় আসল-নকলের একাকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। অতএব, এ ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে।

০ 'সব ধর্ম' বলতে নিশ্চিতরূপেই অনেকগুলি ধর্মকে বোঝায়। যেহেতু পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ অর্থাৎ যিনি ধর্মের মূল উৎস বা স্রষ্টা তিনি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'একটি মাত্র' ধর্ম সৃষ্টি করার কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে সেই একটি মাত্র ধর্মকে স্বীকৃতি জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, কোন মুসলমানের পক্ষে 'সব ধর্ম' বলার কোন সুযোগ আছে কি না সে কথাটাও দয়া করে আপনারা ভেবে দেখবেন।

০ কোন দায়িত্বশীল মুসলমান কর্তৃক 'সব ধর্মের মূলই এক' একথা উচ্চারিত হওয়ার অর্থ-ই হল অন্যান্য ধর্মের মানুষদেরকে একথা বুঝতে সাহায্য করা যে, ইসলামও তাদের ধর্মের মতই একটি ধর্ম। এতদ্বারা ইসলামের গৌরব, সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যকে ভীষণভাবে ম্লান করা হয় কি না এবং এতদ্বারা অপরের পক্ষে ইসলামকে জানা এবং গ্রহণ করার ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টিকে ব্যাহত করা হয় কি না সে কথাটিও বিশেষভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

০ মুসলমান মাত্রেরই এ কথা জানা রয়েছে যে, ধর্মের মূল বলতে বোঝায় 'লা-ই লাহা-ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ—এক অদ্বিতীয়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বশক্তিমান বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্‌র প্রতি অন্তরের অটল ও অবিচল বিশ্বাস এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এমতাবস্থায় একত্ববাদ সম্পর্কে দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালীপূর্ণ কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত থাকলেও প্রকাশ্যত যেসব ধর্ম দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, পৌত্তলিকতা, ইতর

জীবজন্তু এমন কি বিশেষ বিশেষ নর-নারীর গুপ্ত অঙ্গের পূজা করার মতো সম্পূর্ণরূপে একত্ববাদবিরোধী এবং নিশ্চিতরূপে জঘন্য কাজসমূহের শিক্ষা দিয়ে চলেছে, সেগুলিকে কোন মতেই আল্লাহ্ বা সেই মূল উৎস থেকে উৎসারিত বলা যেতে পারে না। এমন কি সেগুলোকে ধর্ম বলে আখ্যায়িত করাকেও চরম অধর্ম না বলে পারা যায় না।

এমতাবস্থায় উদারতা, বিজ্ঞতা, ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রাম-রহীম ও কুরআন-পুরাণকে একাকারকারীদের অনুকরণে পাইকারীভাবে 'সব ধর্মের মূলই এক' এমন কথা বলার কোন সুযোগ কোন মুসলমানের আছে কিনা আপনারা সে কথাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করবেন ; এও আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ।

০ কোন দায়িত্বশীল মুসলমান যখন বলেন যে, 'সব ধর্মের মূলই এক' তখন অন্যান্য ধর্মের মানুষদের অনেকেরই এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, 'মূল' বা গোড়াই হল আসল, অতএব, মূল বা গোড়া যখন ঠিক রয়েছে তখন ভাবনার কিছু নেই। নিশ্চিত রূপেই এটা যে ভুল সিদ্ধান্ত সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় কোন মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসুক বা তৎপর হতে পারে এমন ধরনের বক্তব্য-বিবৃতি প্রকাশ করা সঙ্গত হতে পারে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

০ মুসলমান মাত্রেরই এটা জানা থাকার কথা যে, আদি মানব থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের কাছে ইসলামের যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল এবং অতিভক্ত-অন্ধভক্তের দল তার প্রায় সবগুলিকে নানাভাবে শুধু বিকৃত-অতিরঞ্জিতই করেনি—মিথ্যা, অশ্লীল ও অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ এবং প্রাচীনকালের আজ-গুবী কিস্‌সা-কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে এমনই এক অবস্থায় পরিণত করেছিল যে, সেগুলোকে ধর্মীয় বাণী বলে মনে করার কোন উপায়ই আজ আর নেই।

তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর প্রয়োজন, পরিবেশ, গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ বিধায় ওগুলো যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ ছিল না সে কথাও সহজেই অনুমেয়।

অতএব বিকৃত, অতিরঞ্জিত—অস্বয়ংসম্পূর্ণ এ সব গ্রন্থের পরিবর্তে সকল দেশের সকল যুগের এবং সকল মানুষের উপযোগী একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের

প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, সেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-ই হলো—পবিত্র কুরআন।

দীন বা ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের বাণীটি এ সম্পর্কে লক্ষণীয়। ধর্মের মূল থেকে শুরু করে কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবাদি সব কিছু এতে রয়েছে বলেই যে একে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান বলা হয়ে থাকে সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এমতাবস্থায় যেসব গ্রন্থের মূল খুঁজে পাওয়া এবং সত্যতা নির্ধারণ—এর কোনটা-ই আজ আর সম্ভব নয়—আন্দাজ-অনুমানের উপরে নির্ভর করে সেগুলোর মূল আবিষ্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় না গিয়ে "সব গ্রন্থের মূল শিক্ষা যে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান" এ কথাটিকে বিশ্ববাসীর কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরাই আজ সর্বাধিক প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এ দায়িত্ব একান্তরূপেই মুসলমান সমাজের, এমতাবস্থায় তারা নিজেরাই যদি বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয় তবে শুধু নির্মম ধ্বংস-ই তাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াবে না—বিশ্বের যাবতীয় অন্যায়-অকল্যাণের জন্যেও তাদের দায়ী হতে হবে। অতএব, যে মহাসত্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার সুমহান দায়িত্ব আমাদের উপরে অর্পিত হয়েছে—আসুন! তাকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

খৃস্টান মনীষীদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

খৃস্টান মনীষীদের অনেকেই ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন। তাঁদের সকলের নাম ও পরিচয়কে তুলে ধরতে হলে বিরাট একখানা গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আপাতত তা সম্ভব নয় বলে মাত্র চল্লিশজন পুরুষ এবং দশজন মহিলা—এই মোট পঞ্চাশ জনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো। বলা বাহুল্য এঁরা নিজ নিজ আগ্রহে ইসলামকে জানার চেষ্টা করেছেন এবং যথাযোগ্যভাবে যাঁচাই-বাছাই করার পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

(স্থিরপ্রাজ্ঞ এবং সত্যানুসন্ধিৎসু খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের এঁদের অনুকরণে ইসলামকে জানা এবং যাঁচাই-বাছাই করার জন্যে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি —লেখক)

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১. আলহাজ্জ লর্ড হেড্‌লী আল-ফারুক	ইংল্যাণ্ড	হাউজ অব লর্ডস্-এর সদস্য, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও গ্রন্থকার।
২. লিওপোল্ড ওয়েইস মোহাম্মদ আসাদ	অস্ট্রিয়া	প্রথমে ফ্র্যানফুর্টুর জেইটং (Franfurtur Zeitung) পত্রিকার বিশিষ্ট বৈদেশিক সাংবাদিক, পরে পাকিস্তান সরকারের ইসলামিক পুনর্গঠন বিভাগের ডাইরেক্টর; জাতিসংঘের বিকল্প প্রতিনিধি, Islam at the Cross Road, Road to Mecca

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
		প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি 'আরাফাত' নামে একটি পত্রিকাও বের করেছেন।
৩. স্যার আবদুল্লাহ্ আর্চিবাল্ড হ্যামিলটন	ইংল্যাণ্ড	প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ, ব্যারোনেট ও জমিদার।
৪. মোহাম্মদ আলেক জাণ্ডার রাসেল ওয়েব	ইউ.এস.এ.	সেন্ট জোসেফ গেজেটের সম্পা- দক, কূটনীতিবিদ, গ্রন্থকার; আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের ইসলাম প্রচার মিশনের অধ্যক্ষ।
৫. স্যার জালালুদ্দীন লাউডার ব্রান্টন	ইংল্যাণ্ড	কূটনীতিবিদ ও জমিদার।
৬. মোহাম্মদ আমান হোবোহ্‌ম এম. এ., পি. এইচ. ডি, এল. এল. ডি.; এফ. এস. পি.	জার্মানী	রাজনীতিবিদ, ধর্ম প্রচারক ও সমাজকর্মী।
৭. প্রফেসর হারুন মোস্তাফা লিয়ন	ইংল্যাণ্ড	প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার "La Societ International de philologie, Sciences et Beaux Art"-এর ভূতপূর্ব সেক্রেটারী জেনারেল। তিনি লণ্ডন হতে প্রকাশিত 'The Philomathe' নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।
৮. ডাঃ আলী সেলম্যান বিনোইস্ট	ফ্রান্স	ডক্টর অব মেডিসিন।
৯. ডঃ ওমর রল্‌ফ্ ব্যারন এহরেন ফেলস্	অস্ট্রিয়া	নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।
১০. আলহাজ্জ ডঃ আব্দুল করীম গার্মেনাস্	হাঙ্গেরী	প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক।

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১১. ডাঃ হামিদ মারকাস্	জার্মানী	বৈজ্ঞানিক, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক।
১২. উইলিয়াম বার্চেল পিকার্ড	ইংল্যাণ্ড	গ্রন্থকার, কবি ও ঔপন্যাসিক।
১৩. কর্নেল ডোনাল্ড্ এস্. রক্‌ওয়েল	ইউ.এস.এ.	কবি, গ্রন্থকার ও পুস্তক সমালোচক।
১৪. প্রফেসর আর. এল. মেল্লেমা	হল্যাণ্ড	নৃতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক।
১৫. মুহাম্মদ জন ওয়েবস্টার	ইংল্যাণ্ড	ইংলিশ মুসলিম মিশনের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী।
১৬. ইসমাইল উইয়েল মেজিয়েৎস্কি	পোল্যাণ্ড	বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী।
১৭. মেজর আব্দুল্লাহ ব্যাটার্সবে	ইংল্যাণ্ড	বৃটিশ সেনাবাহিনীর মেজর।
১৮. হুসেইন রৌফ	"	বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও গ্রন্থকার।
১৯. থমাস ইরভিং	ক্যানাডা	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী।
২০. ফৈজুদ্দিন আহমদ অভারিং	হল্যাণ্ড	প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও লেখক।
২১. ওমর মিতা	জাপান	বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী।
২২. আলী মোহাম্মদ মোরী	জাপান	অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী।
২৩. প্রফেসর আবদুল আহাদ দাউদ বি. ডি.	ইরান	প্রাক্তন রেভারেণ্ড ডিভিড বেঞ্জামিন কেলডানী বি. ডি.

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
২৪. এইচ. এফ. ফেলোজ	ইংল্যাণ্ড	রাজকীয় নৌবহরের প্রাক্তন কর্মচারী।
২৫. মুহাম্মদ সুলায়মান তাকেউচি	জাপান	জাপানের মানব জাতিতত্ত্ব সোসাইটির সহযোগী।
২৬. এস. এ. বোড	ইউ.এস.এ.	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী।
২৭. বি. ড্যাভিস্	ইংল্যাণ্ড	ল্যাটিন, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষা অধ্যয়নরত বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র।
২৮. টমাস মুহাম্মদ ক্ল্যাটন্	ইউ. এস. এ.	বিশিষ্ট সমাজকর্মী।
২৯. জে. ডবলিউ লাভ গ্রোভ্	ইংল্যাণ্ড	প্রখ্যাত চিন্তাবিদ।
৩০. টি. এইচ. ম্যাক বার্কলি	আয়ারল্যাণ্ড	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক।
৩১. ডেভিস্ ওয়ারিংটন ফ্রাই	অস্ট্রেলিয়া	প্রখ্যাত সাহিত্যিক।
৩২. ফারুক বি. কারাই	জাঞ্জিবার	বিশিষ্ট সমাজকর্মী।
৩৩. মুমিন আবদুর রাজ্জাক সেল্লিয়া	সিংহল	বিশিষ্ট সাংবাদিক।
৩৪. আবদুল্লাহ্ উয়েমুরা	জাপান	ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ।
৩৫. ইবরাহীম ডু	মালয়	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।
৩৬. মোহাম্মদ গুন্নার এরিক্সন্	সুইডেন	প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ।
৩৭. মিঃ রেক্সইনগ্রাম	ইউ. এস. এ.	ইনি আমেরিকার কোটি-পতি ধনকুবের, বিখ্যাত Garden of Allah

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
		নামক চিত্রনাট্যের প্রযো-জক।
৩৮. মিঃ রশীদ সার্প	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, সুবি-দ্বান ও সমাজকর্মী।
৩৯. মিঃ জে. মাইকেল	ইংল্যাণ্ড	সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন, সম্মানের সাথে বি. এ. পাস করার পর গর্ডন কলেজে চাকরি করেন।
৪০. আবদুল্লাহ্ ওয়াট কিন্স	ইংল্যাণ্ড	লণ্ডন নগরীর এক বিখ্যাত পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন, সুপণ্ডিত ও লেখক।
৪১. মিস মাস্উদা স্টেইনম্যান	ইংল্যাণ্ড	
৪২. মিস ম্যাডিস বি. জলি	”	
৪৩. লেডি এড্মিল জয়নাব কব্বল্ড্	”	এঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের। ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনা করার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
৪৪. মিসেস সেসিলিয়া মাহমুদা ক্যারোলী	অস্ট্রেলিয়া	
৪৫. মিস ফাতেমা কাজুয়ে	জাপান	
৪৬. মিসেস আমিনা মোসলের	জার্মানী	
৪৭. মিস্ হেদায়েৎ বাড্	হল্যাণ্ড	
৪৮. মিস্ মরিয়ম জমীলা	আমেরিকা	
৪৯. মিস জুলি নাজিয়া	লণ্ডন	
৫০. মিস ফিরোজা জ্যানেট ক্যারোল	ইউ. কে.	

ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে খৃস্টান মনীষীদের অভিমত

(অন্যান্য ধর্মাবলম্বী প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিদের অনেকে ইসলামের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়েও নানা কারণে পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন না। অগত্যা মনের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের অভিমতকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং তা থেকে যথেষ্ট প্রেরণাও লাভ করেছিলাম।

যেহেতু খৃস্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনাই এই পুস্তক লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব অন্যদের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমতের যেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার কতিপয়কে বেছে নিয়ে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। আশা করি, অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা হলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই এ থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারেবেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মি. বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর 'লাইফ অব মুহাম্মদ (সা.)' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"একটি মহাজাতি, একটি মহাসাম্রাজ্য, একটি মহাধর্ম—এই তিনটির একত্র সমাবেশ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম। যাহার তুলনা কোথাও নাই—যা হযরত মুহাম্মদ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নিরক্ষর—বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন। অথচ এমন এক গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন যাহা একাধারে কাব্য, দৈনন্দিন উপাসনা পুস্তক, ব্যবস্থাপত্র ও বিরাট ধর্মশাস্ত্র।"

বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি জর্জ বার্নার্ড শ' তাঁর 'গেটিং মেরেইড' নামক পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—"এক শতাব্দীর মধ্যে সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষত ইংল্যাণ্ড ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন 'দি লাইট' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। উক্ত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ হলো—"আমি হযরত মুহাম্মদের ধর্মকে সর্বদা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশেষ প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। তাহার কারণ, এই ধর্মের ভিতর অত্যাশ্চর্য জীবন-শক্তি বিদ্যমান। ---- আমার বিশ্বাস হযরত মুহাম্মদের মত কোন মানুষ যদি বর্তমান জগতের মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিবার জন্য নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া মানবমণ্ডলী যাহাতে সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন।-----আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, হযরত মুহাম্মদের ধর্মের অনুপ্রেরণায় জাগরিত হইয়া ইউরোপ আজ যাহা গ্রহণ করিবার সূচনা করিয়াছে, কাল তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে। মধ্যযুগে খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম ধর্মকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল এবং হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী মানব সম্বন্ধে আমি যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহাকে খৃস্টের বিরোধী বলিয়া অভিহিত না করিয়া 'মানবের উদ্ধারকর্তা' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—।" (দি লাইট, জানুয়ারি ১৯৩৩)

ইংল্যাণ্ডে 'চার্চ কংগ্রেস অব ইংল্যাণ্ড' নামক মহাসভার অধিবেশনে প্রথিতযশা রেভারেণ্ড কাম্নন আইজাক টেলর তাঁর বক্তৃতায় উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন—"জগতের বহু দেশ ব্যাপিয়া ইসলাম ধর্ম মিশনারী ধর্মরূপে খৃস্টান অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা পরিহার-পূর্বক ইসলাম ধর্মের লোকের সংখ্যা কেবল যে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত লোক-সংখ্যা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক তাহাই নহে, পরন্তু সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের প্রতিযোগিতায় খৃস্টধর্ম প্রচার ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিসমূহকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এখন কোন নূতন স্থানে ধর্ম প্রচার করা তো দূরের কথা, যে স্থানসমূহে পূর্বে খৃস্টধর্ম প্রচারিত ছিল, তাহাও ক্রমশ খৃস্ট-ধর্ম প্রচারকগণের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইসলাম ধর্ম মরক্কো হইতে জাভা এবং জাঞ্জিবার হইতে সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং সম্প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব

বিস্তার করিয়া ইসলাম সুদীর্ঘ পদ-বিক্ষেপে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি সকল মহাদেশই অধিকার করিতে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। কঙ্গো জামবেশীতে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিগ্রো অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উগাণ্ডা দেশও সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিমূল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক মুসলমান।"

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ জি. সি. ওয়েলস লিখিয়াছেন—"আরবদের ভিতর দিয়াই বর্তমান জগত তাহার আলো ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়া নহে।"

"হস্টোরিয়ান হিস্টোরি অব দি ওয়ার্লড"-এর ৭ম ভলিউম, ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে "মধ্যযুগে আরবরাই সভ্যতার একমাত্র প্রতীক ছিলেন। উত্তর হইতে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণে বিপর্যস্ত ইউরোপকে তাঁহারাই বর্বরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

মেজর আর্থার মিন লিওনার্ড—তাঁর 'ইসলাম ও তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"ইসলামের প্রতি ইউরোপের হীন অকৃতজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ভাবের পরিবর্তে সাধারণ কৃতজ্ঞতার ভাব থাকা উচিত। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন যুগে মানব যখন কলহ-বিবাদ ও মূর্খতায় নিমগ্ন ছিল, তখন আরবদিগের অধীনে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিয়া মুসলিম সভ্যতার উজ্জ্বল প্রভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং উহা ইউরোপের শেষ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করিতে দেয় নাই। আরববাসীদিগের উচ্চশিক্ষা, সভ্যতা, মানসিক ও সামাজিক উৎকর্ষ এবং তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হইলে ইউরোপ অদ্যাপিও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিত।"

'হেনরী লুইস তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে লিখেছেন': "মুসলমানগণই ইউরোপে বিদ্যা ও দর্শন আনয়ন করিলেন। এই মহৎ কার্যের জন্য ইউরোপ তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। গণিত শাস্ত্র, ভেষজ রত্নাবলী এবং রসায়ন বিদ্যার জন্যও তাঁহাদের নিকট উপকার স্বীকার করে। তাঁহাদের স্পেন হইতে ফ্রান্সের অভ্যন্তর দিয়া খৃস্টরাজ্যসমূহে বিদ্যার বিস্তার সম্ভব হইয়াছে।"

রেভারেণ্ড মার্গোলিয়থ এম. এ. লিখেছেন: "ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গ মর্ত্যের সৃজন পালন ও রক্ষাকর্তা, সর্বজ্ঞানময় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়—এই ঐশী স্বভাব অতি তেজস্বিতার সহিত হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিতে পবিত্র কুরআন সর্বোচ্চ প্রশংসনীয় মহাধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বহু তত্ত্বপূর্ণ নীতিকথা, গভীর জ্ঞানোপদেশ এবং ওজস্বিনী রাজনীতি এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা সম্যক প্রকারে আলোচনা করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিতে পারিলে একটি প্রবল শক্তিশালী জাতি গঠিত হইতে পারে। এই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত বিপুল কর্মশক্তি এবং তত্ত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য যাহা হইতে সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি মানব জীবনের সমস্ত কার্য-প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে তাহা এই প্রকারে গৌরব ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া জাতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং যাহারা ইচ্ছাপূর্বক পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এই পবিত্র কুরআনই তাহাদিগের চিরাচরিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদিগকে মানবত্বের মধুর সৌন্দর্যে পরিস্ফুট করিয়াছিল।—সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে আমরা কখনই বিস্মৃত হইতে পারি না যে, মধ্যযুগে ইউরোপ আরব মনীষীগণের লিখিত দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিয়া বিশেষরূপে অনুগৃহীত হইয়াছে।"

'**জার্মান স্কলার এবং ফিলোসফার এমানুয়েল ডাস লিখেছেন**: "কুরআন এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহারই প্রভাবে আরব জাতি পুরাতন রোম ও গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।— কেবলমাত্র আরব জাতিই কুরআনের পবিত্র প্রভাবে বিজয়ী বেশে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কুরআনের প্রভাবেই আবার তাঁহারা এই সমস্ত বিজিত জাতির সহিত একত্রিত হইয়া সমগ্র দেশে দয়ার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল তখন আরব জাতি কেবল কুরআনের পবিত্র প্রভাবেই গ্রীস দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ্ক এবং সঙ্গীত বিদ্যার প্রচার করেন। বিজ্ঞান যুগের বর্তমান উন্নতির মূলে কুরআনের প্রভাব যে অলক্ষিতভাবে বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ই. ফা. বা.—৯০-৯১—প্র./৩২০৯ (উ)—১০,২৫০



ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ